"ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

—বিবেকানন্দ।

"সেবাধর্ম্মঃ পরমগহনোযোগিনামপ্যগম্যঃ ॥"

স্বামী নরোত্তমানন্দ-
প্রণীত

প্রকাশক
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
৺কাশীধাম
১৩৩৭

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীগুরুদেব-শ্রীচরণকমলে

নিবেদন

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব গঙ্গাস্রোতের মত পর্ব্বত-বনের বেদান্তকে ঘরে ঘরে আনিয়া দিয়া সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিবার যে অভিনব ভাব প্রদান করিয়াছেন, এই পুস্তকে তদনুরূপ আচরণ সমূহই দেখান হইল। অপর দিকে, উহা কাশী সেবাশ্রমের বিগত পঞ্চবিংশতি বৎসরের ইতিহাস মাত্র।

এই পুস্তকের পাঠক-পাঠিকাগণ ও কর্ম্মিগণের কেহ যদি ইহার দ্বারা কণামাত্রও তৃপ্ত হন বা কর্ম্ম-পথে সহায়তা লাভ করিতে পারেন, তবেই উহা প্রকাশ করার পঞ্চবর্ষব্যাপী শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এই পুস্তকখানির জন্য যাঁহারা ধন্যবাদ লাভের যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি, তাঁহাদের মধ্যে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের নামই প্রথম উল্লেখযোগ্য। তিনিই উহাকে পুস্তকাকারে প্রথম সাজাইয়াছেন এবং তাঁহার মধুময় বর্ণনামাধুর্য্যও পাঠক-পাঠিকাগণ স্থানে স্থানে উপভোগ করিবেন। তৎপর, আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়, পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই সাধারণে উহা প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। সুতরাং এই পুস্তক লেখার সকল গৌরব তাঁহাদিগেরই প্রাপ্য। ইহার নোট লেখার এবং কপি লেখার জন্য বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি শ্রীযুক্ত আদীশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি, এ, শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ সরকার, বি, এল, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ, বি, এল এবং শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাস মহাশয়গণের নিকট হইতে, আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। ইতি—

১৩৩৭ সাল }
ভাদ্র }

নিবেদক
শ্রীনরোত্তমানন্দ

এই পুস্তকখানির বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৺কাশীধাম শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে পীড়িত এবং দুঃস্থ অথর্ব্বগণের সেবায় ব্যয়িত হইবে। ইতি

—শ্রীনরোত্তমানন্দ

ভূমিকা

শ্রীমৎ স্বামী নরোত্তমানন্দ 'সেবা' গ্রন্থখানি আমাকে দেখিয়া দিতে অনুরোধ করায়, আমি ইহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়া দিয়াছি। স্বামী নরোত্তমানন্দজীর ভাষা ও ভাবকে বজায় রাখিয়া যতটুকু পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন সম্ভবপর মনে করিয়াছি, তাহাও করিয়াছি। এই প্রথম তাঁহার সাহিত্য রচনার প্রয়াস, সুতরাং এক্ষেত্রে নানাপ্রকার ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও তিনি যেরূপ দক্ষতার সহিত এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন, তাহা যে বিশেষভাবে প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ পৃথিবীবিশ্রুত গুরু ও শিষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই মহাপুরুষদ্বয়ের যুগোচিত শিক্ষায় ও আদর্শে অনুপ্রাণিত রামকৃষ্ণ মিশন কেমন করিয়া অধঃপতিত ভারতের আধ্যাত্মিক ও ঐহিক সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয় সাধনের জন্য প্রাণপণে ভারতের সকল প্রদেশেই স্বার্থ-গন্ধবিরহিত সর্ব্বহিতকর কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান করিতেছে, তাহারই স্বল্পমাত্র পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এই গ্রন্থে কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক ইতিহাস এমনই সুন্দর ও সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহা পাঠ

করিলে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বিমল আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন। অদ্বৈত বেদান্ত যে কেবল সর্ব্বত্যাগী লোকালয়-সম্পর্কশূন্য আরণ্যক যতিগণের সেব্য, এই প্রকার ধারণা অতি-প্রাচীনকাল হইতে এদেশে বদ্ধমূল ছিল, কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তের অধিকার যে, সকল আশ্রমের মানুষেরই আছে এবং অদ্বৈত বেদান্তের প্রভাব সাধারণ জনসমূহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে, মানবজীবন সুখময় ও শান্তিময় হইয়া থাকে, এই জাজ্বল্যমান সত্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব নূতন ভাবে ভারতকে বুঝাইয়া যে সাধনমার্গ প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, রামকৃষ্ণ মিশন তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মিশনের আড়ম্বরশূন্য কার্য্যপ্রণালীর অন্তরঙ্গ পরিচয় যাঁহাদের ঘটিয়াছে, তাঁহারা এই সত্যের সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। প্রতি জীবদেহে বিরাজমান আত্মাই ব্রহ্ম। দেহভেদ থাকিলেও তোমার, আমার ও অপরের আত্মা বস্তুতই এক, তাহাতে কোন ভেদই নাই—ভেদজ্ঞান ভ্রান্তিমাত্র এবং এই ভ্রান্তিই এ সংসারে সকল প্রকার অনর্থের মূলীভূত কারণ, পরমহংস দেবের এই সারবান্ উপদেশ কেমন করিয়া সংসারী মনুষ্যের জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে সকলের সেবক করিয়া তুলিয়া থাকে—কেমন করিয়া তাহাকে সংসারের সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া পীড়িত, আর্ত্ত, বিপন্ন ও দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন নরনারীর সেবায় অকাতরে আত্মবিসর্জ্জনের জন্য প্রবৃত্ত করে, তাহা এই 'সেবা' গ্রন্থে অতি পরিস্ফুট ভাবে চিত্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ঘটনাবলীর মধ্যে ঔপন্যাসিক বৈচিত্র্য নাই—কবি-কল্পনার উদ্দাম সৃষ্টিকুশলতাও ইহার কোন অংশে পাঠকের চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করে না, ইহা সত্য, কিন্তু ইহাতে বর্ণিত কার্য্যাবলীর কেন্দ্র-শক্তি-স্বরূপ চারুচন্দ্র বা শুভানন্দস্বামীর লোকোত্তর চরিত্র বর্ত্তমান যুগের সমস্ত ঔপন্যাসিক চরিত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, অথচ ঐ

চরিত্র-সৃষ্টির জন্য অণুমাত্রও কল্পনা-তুলিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। উহার সকলই স্বাভাবিক, সকলই সাধারণের দৃষ্টিগোচর, সকলই ধ্রুব ও জাজ্বল্যমান সত্য। বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকা মাত্রেই এই আত্মহারা সেবা-পাগল, শান্ত, দান্ত, নিরহঙ্কার, অক্লান্তকর্ম্মী, কর্ম্মকুশল ও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সুরলোক-দুর্লভ মধুর চরিত্র পাঠ করিয়া আপনাকে—আপনার দেশকে ও আপনার জাতিকে ধন্য বলিয়া বোধ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা দেখিবেন—

ন কাময়েহং গতিমীশ্বরাৎপরা
মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যে হখিলদেহভাজা
মন্তঃস্থিতো যেন ভবস্ত্যদুঃখাঃ ॥

এই পুরাণ-বর্ণিত ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল আদর্শ যেন চারুচন্দ্রের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। আত্মবিস্মৃত ভারতের নরনারীগণকে আবার আর্য্য ঋষিগণের চিরাচরিত সাধনামার্গে ফিরাইয়া লইবার জন্য চারুচন্দ্র মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে যুগাবতার পরমহংস দেবের বিশ্ববিজয়িনী বৈজয়ন্তী স্কন্ধে বহন করিয়া এই সেদিন আমাদের মধ্যেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহা কল্পনা নহে—ইহা নিদাঘ মধ্যরজনীর স্বপ্ন নহে; ইহা বাস্তব সত্য। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়াবতার পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং নব্যভারতের নব্য-সাধনার ভাব-ভাগীরথীর প্রবর্ত্তক নব শঙ্করাবতার স্বামী বিবেকানন্দ যে দেশে ও যে জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছেন, সে দেশে ও সেই জাতির মধ্যে চারুচন্দ্রের ন্যায় বিশ্বপ্রেমিক আর্ত্তসেবক দরিদ্রবন্ধু ও অনাথ-সহায় আত্মহারা পুরুষ-রত্নের আবির্ভাব বিস্ময়াবহ ঘটনা না

হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে বর্ত্তমান দেহাত্মবাদ-প্লাবিত যুগে একান্ত অপেক্ষিত, তাহা কে না স্বীকার করিবে?

'সেবা' গ্রন্থে এই মহনীয় চরিত্র নিখুঁত ভাবে ফুটাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমি আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসিবন্ধু শ্রীমৎ স্বামী নরোত্তমানন্দজীকে আনন্দের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের পক্ষ হইতে অভিনন্দিত করিতেছি।

৺কাশীধাম
শিবালয়
৩০শে ভাদ্র, ১৩৩৭ সাল

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

সেবা

পূর্ব্বাভাষ

কবি বলিয়াছেন, ভগবান্ আপনি মোহিত হইবার জন্যই গানের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভক্ত বলেন, আপনাকে ধরা দিবার জন্যই শ্রীভগবান্ প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই প্রেমের পূর্ণতা হয় সেবায়।

বেদে দেবীসূক্তে দেখিতে পাই যে, যখন প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ প্রাতঃস্মরণীয় ঋষিগণ বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া গিয়া চিন্তা করিতেন যে,—এই অনন্ত বিশ্ব কোথা হইতে হইল? এবং তাঁহারা নিজেরাই বা কে? এই দৃশ্যমান্ জগৎ, এই সব জড় ও জীবগণ কে? তখন তাঁহারা সমাধিবলে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, একই চিদানন্দময়ী মহাশক্তি হইতেই সমুদয়ের সৃষ্টি হইয়াছে—চেতন, অচেতন এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্তই সেই একই মায়ের সন্তান, তাঁহারই লীলা-বিভূতি। তখন কি অতুল প্রীতিতে, কি এক অব্যক্ত আনন্দ-রসে সম্পূর্ণ জগতে

সকলকেই একান্ত আপন ভাবিয়া, কি অপূর্ব্ব প্রেমেই তাঁহাদের চিত্ত ভরিয়া গিয়াছিল!

প্রাণস্পর্শী অনাহত প্রণব-ঝঙ্কারে মুখরিত হইয়া সেই মহা-ভাবরাশিই আজ মানুষকে জানাইয়া দিতেছে সেই মহাশক্তির কথা, যে-শক্তি হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাহা-কিছু সবের সৃষ্টি হইয়াছে এবং যিনি নিত্য সকলের মধ্যে আত্মরূপে অবস্থান করিয়া সকলকেই রক্ষা করিতেছেন, সেই মাতৃস্বরূপিণী মহাশক্তির অনাদি—অনন্ত—অন্তর্মুখ আকর্ষণই প্রেম!

কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এই এক কথাই বলিয়া আসিতেছেন যে—গ্রহে উপগ্রহে, জড়ে ও চেতনে, অণু ও পরমাণুতে এবং মানুষের উন্নত ও বিকসিত হৃদয়ের প্রতি কণায়—এই প্রেমই আপনি আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনারই পরিচয় দিতেছে। দর্শন এই প্রেমের পরিচয় দিতে যাইয়া অবশেষে তাহাকে রসস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। বিজ্ঞান শাস্ত্রও আপনার হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া জগতে এই অসীম প্রেমের কথা—সকল জিনিষের সহিত সকলের অবিরাম এই মাখামাখি ভাবের কথা, তার পাতায় পাতায় লিখিয়া যাইতেছে। আজও সে লেখার শেষ হয় নাই। সাহিত্য কোথাও প্রস্ফুটিত প্রাণের মধুর হাস্যে, আবার কোথাও বা করুণ অশ্রুর নির্ঝরে এই প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া চলিয়াছে।

জগতের বিরাট্ জনসঙ্ঘের মধ্যে কেহই তো আপন লইয়া কম ব্যতিব্যস্ত নয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আপন ভাবের এবং আপনার বাসনার অবিশ্রান্ত সংগ্রামে তাহার নিত্য-উপার্জ্জিত সাধন-সম্ভার পলে পলে ক্ষীণ হইয়া চলিতেছে। তবুও তো সকল কালে এবং সকল দেশেই, এমন কি নির্জ্জন পল্লীতে অথবা অজস্র কর্ম্মকোলাহলময় নগরে, অবস্থার অনুরূপ জীর্ণ পর্ণকুটীরে বা অট্টালিকার মধ্যে বসিয়াও, মানুষ সমস্ত পরিচিত স্বার্থের অতিরিক্ত কোনো আর একটি বস্তুকে চিরদিনই কাঙ্গালের মত চাহিয়া আসিতেছে? ধন তাহাকে সুখী করিতে পারে নাই, মান তাহাকে শান্তি দিতে পারে নাই—কোনো প্রলোভনীয় বস্তুই তাহার অন্তরকে জুড়াইতে পারে নাই। সকল স্বার্থের উপরে কি দেখিয়া যেন তাহার মন কাঁদিয়া উঠে, অথচ সে কান্নায় সমস্ত প্রাণ ভরিয়া মানুষ বল পাইতেছে। যে ত্যাগে ভারতবর্ষ এতকাল জগতে অপরিমিত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, সমস্ত জগতের ছোট-বড় সকল মানুষেরই মন সেই ত্যাগের কণামাত্র স্পর্শে আপনার অপেক্ষা আপনাকেও বর্জ্জন করিয়া, পরের দুঃখকে জীবনের এক সময় না এক সময় কেন প্রাণ দিয়া আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছে? জগতের এই যে পরম নিগূঢ় রস, এই যে রসঘন প্রেম ইহার উপরেই সমস্ত জগৎ ধৃত হইয়া রহিয়াছে, কি সুখে, কি দুঃখে, মানুষ কোথাও আপনাকে লইয়া, কোথাও বা আপনাকে

ভুলিয়া, এই প্রেমের জন্যই আপনাকে এবং আপনার সর্ব্বস্বকে সেবার অঞ্জলি প্রদান করিয়াছে। কাহাকে সে অঞ্জলি দিয়াছে? জগৎকে প্রেমস্বরূপ সেই আদ্যাশক্তির মূর্ত্তি জানিয়াই, তাঁহারই সত্তায় অকম্পিত হৃদয়ে আপনার সত্তা বিলাইয়া দিয়াছে—দিয়াছে কেহ শ্রদ্ধায়, কেহ স্নেহে, কেহ প্রণয়ে, কেহ বা বৈরাগ্যে—সকলেরই কিন্তু, পর্য্যবসান শেষে এই প্রেমের সেবাতেই হয়।

আমাদের মনে হয়, প্রেম একেবারে সাক্ষাৎ মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক দেখা দিয়া থাকে—একমাত্র এই সেবাতেই। কেননা, যিনি শ্রদ্ধা করেন, তিনি সেবা দ্বারাই সে শ্রদ্ধা ফুটাইয়া থাকেন; যিনি ভালবাসেন, এই সেবা দ্বারাই ভালবাসাকে তিনি পরিপূর্ণ করিতে চাহেন। সেবা ভিন্ন প্রেমের পূর্ণতার আর কোনো উপায়ই নাই। জগতে একমাত্র সেবাদ্বারাই সকল স্থানে ও সকল সময়ে প্রেমের পরাকাষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

মা যে সন্তানকে যত্ন করেন, ভাই যে ভাইয়ের গলা জড়াইয়া আনন্দ উপভোগ করেন, বন্ধু যে বন্ধুকে হৃদয়ে তুলিয়া অসীম প্রীতি বোধ করেন—এই সকল ভাবের মূলেই তো সেবার চেষ্টাটি লুকাইয়া রহিয়াছে। ইহা তো গেল আপন জনের কথা, যেখানে তাহার সহিত আমার বাহ্যতঃ কোন সম্বন্ধ নাই, যখন তাহার সকল অনুভূতির সঙ্গে কি সুখে কি দুঃখে আমার হৃদয়ের অনুভূতি এক হইয়া, তাহাকে বুকে তুলিয়া

লইতে ইচ্ছা হয়, তখনই সেবার আনন্দময়ী মূর্ত্তি, মানবের জীবন উজ্জ্বল করিয়া দেখা দেয়। শুধু যে দেখা দেয়, তাহা নয়—এই সেবারূপিণী নিত্যানন্দময়ীর আলোক-ধারাই মানবজীবনের সকল তমোরাশি নাশ করিয়া, মানবত্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌টিকে মানবের হৃদয়াসনে আনিয়া দেয়। তখনই মানুষ জানিতে পারে এবং দেখিতে পায় যে, সে মানুষ, সে সেই 'মহতোমহীয়ানে'র অংশ, সে সেই আলোর সাম্রাজ্যেরই একজন, ক্ষুদ্র এবং মহৎ যাহা কিছু, সমস্তই তাহার ভিতর এক হইয়া ফুটিয়া উঠিয়া থাকে এবং তার আত্মা সমস্ত জগতের ভাবরাশিকে তাহার অভ্যন্তরে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

এই সেবার অধিকার যে মানব যখন যতটুকু পায়, সে-ই তখন ধন্য হইয়া যায়। তখন প্রেমোচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে তাহার অন্তরাত্মা বলিতে থাকে "কোথায় আমি, আর কোথায় বা তুমি—তুমিই যে সব, তোমাতেই আমার সার্থকতা, তোমাতেই আমার মুক্তি—হে অনন্তস্বরূপ, হে অন্তহারা ভাবময়, তুমিই ত আমার পরমানন্দ"। ভাবের এই বিগলিত গঙ্গা, সেবার এই করুণা-নির্ঝরিণী যুগে যুগে মানুষকে মহান্, মুক্ত এবং পরমানন্দে বিভোর করিয়া তুলিতেছে।

তিনি যে কোনো ক্ষুদ্রতম কারণ মধ্যে বা বীজ মধ্যে তাঁহার কোন্ ভবিষ্যৎ কামনা গুপ্তভাবে রাখিয়া দিয়াছেন, তাহা তিনি স্বয়ং অথবা তাঁহারই বিশেষ কৃপান্বিত ব্যক্তি ছাড়া

আর কে জানিতে পারে? সেই বিশ্বনিয়ন্তার কোন্ অজানা ইচ্ছা কোন্ পরম উদ্দেশ্যে, তৃণ হইতে উচ্চতর পর্ব্বতশিখরে, সামান্য বহ্নিকণা হইতে দীপ্ত আদিত্যমণ্ডলের তেজোরাশির মধ্যে কি অপূর্ব্ব লীলাই করিয়া চলিতেছে, তাহা আমরা কেমন করিয়া জানিব?

কোন্ শুভমুহূর্ত্তে স্বাতী নক্ষত্রের জলকণা, কোন্ ঝিনুকের বুকে পড়িয়া তাহার কোমল অভ্যন্তরে সহসা মুক্তারূপে দেখা দিবে, তাহা সেই ইচ্ছাময়—প্রেমময়—শ্রীভগবান্ ভিন্ন কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই।

প্রথম অধ্যায়।

সেদিন মুক্তিক্ষেত্র বারাণসী নগরীর পথে-ঘাটে জন-কোলাহলের আনন্দধ্বনি-মুখরিত পবনে ভগবান্ বিশ্বনাথের জয়-গান দিগ্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিতেছিল এবং তরুণ অরুণের স্নিগ্ধ আলোকে মধুর-ধীর সানাইএর ভৈরবরাগের সঙ্গে তালে তালে মিশিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছিল। কত ধনী, কত দরিদ্র, কত সবলকায়, কত দুর্ব্বল, কত পুরুষ, কত স্ত্রী, কত ব্রহ্মচারী এবং কত সন্ন্যাসী ৺বিশ্বনাথের প্রভাত-আরতি দর্শনের আনন্দভরে মগ্ন হইয়া বারাণসীর পথরাজি বহিয়া দিকে দিকে আপন-মনে চলিতেছিল। কত অন্ধ, কত খঞ্জ ও কত দীন-দরিদ্র, পুণ্যশীল মানবের হস্তনিক্ষিপ্ত তণ্ডুল-কণাগুলিকে মাতা অন্নপূর্ণার আশীর্ব্বাদস্বরূপ গ্রহণ করিবার প্রত্যাশায়, তাঁহারই মন্দির-প্রাঙ্গণাভিমুখে ছুটিতেছিল; কিন্তু, ঐ যে আবর্জ্জনা-পূর্ণ পথের এক পার্শ্বে ব্যাধিপীড়িতা এক মুমূর্ষু বৃদ্ধার অস্ফুট কাতরধ্বনি, যাহা ক্ষীণভাবে উত্থিত হইয়া আরও ক্ষীণতরভাবে মহাকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছিল —হায়! সে ক্ষীণ করুণ ধ্বনি কাহারও কর্ণকুহর স্পর্শ করিতেছিল না! অসহায়, উপেক্ষিত, মরণের দ্বারে উপনীত, হতভাগ্য মানবের এইরূপ কাতরতাময় কত ক্ষীণ কণ্ঠস্বর এমনিভাবে যুগ-যুগান্ত ব্যাপিয়া মহাকাশে মিশাইয়া গিয়াছে;

এখনও দিগ্‌দিগন্তে প্রতিদিনই মিশিতেছে। সেদিনও হয়ত এম্‌নি করিয়া তাহা মিশিয়া যাইতেছিল, কিন্তু জানি না, কোন্ বিরাট অশ্বত্থের বীজ শ্রীবিশ্বনাথ তাঁহার এই আনন্দ-কাননের এক কোণে কোন্ উপলক্ষ্যে কাশীর পাষাণ-স্তর ভেদ করাইয়া কোন্ ছলে সেদিন বপন করিলেন! বৃদ্ধার ক্ষীণ কাতরধ্বনি পলে পলে ব্যর্থ হইয়া আজিও যাইতেছিল, হয় তো এই পুণ্যতীর্থের পবিত্র বাতাসও ব্যথিত হইয়া অবশেষে স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু, সকল নীরবতাকে অতিক্রম করিয়া যিনি তাঁহার আনন্দ-ডমরু আজ বাজাইয়া তুলিলেন, তিনি সেই প্রভাত পবনের মৃদু লহরীর মধ্যে কোমল প্রেমের মধুর স্পর্শের মত এই বৃদ্ধারও অতি নিকটে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। নহিলে, যে-পথে জনমানব বড় একটি কেহ যাতায়াত করিতেছিল না, সে-পথে আজ অকস্মাৎ কেন এক হৃদয়বান্ যুবক আসিয়া দেখা দিল! বিরামদায়িনী রজনীর নীরবতা এখনও ভাল করিয়া ঘুচে নাই; এই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সেই স্থানে কেন আর্ত্তের ব্যথায় ও করুণায় এই যুবকের হৃদয় তেমন করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল!

যুবক ধীরে ধীরে সেই আবর্জ্জনারাশির পাশ হইতে রোগজীর্ণা পুরীষ-মূত্র-সমাচ্ছাদিতা মুমূর্ষু বৃদ্ধাকে তুলিয়া লইল এবং অতি সন্তর্পণে তাহার গাত্র পরিষ্কৃত করিয়া, আপন উত্তরীয়খানির দ্বারা আবৃত করিয়া সেই পথিপার্শ্বেই তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বসিল।

সেদিন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন, উষার অরুণ কিরণ সবেমাত্র জাহ্নবীর মৃদুনাদিনী উর্ম্মিমালাতে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। যুবক যামিনী-রঞ্জন প্রত্যূষে সেই পবিত্র জাহ্নবীবারিতে অবগাহনের জন্য চলিতেছিলেন। যে স্থানটিতে ঐ বৃদ্ধা তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইয়াছিল, সে স্থানটি পুঁটিয়ারাণীর ছত্রের নিকটবর্ত্তী বাঙ্গালীটোলায়। তখনও ছত্রের দ্বার খোলা হয় নাই বলিয়া, স্থানটি একবারে নির্জ্জন ছিল। যুবকটি বৃদ্ধার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবিলেন, যদি আর অল্প সময়ের মধ্যে কোনও আশ্রয়, ঔষধ ও পথ্য ইহাকে দিতে না পারি, তবে তো বৃদ্ধাকে রক্ষা করিতে পারিব না। কাহাকেও তো এখানে দেখিতেছি না। আমি তো কপর্দ্দকশূন্য এবং ভিক্ষান্নেই জীবনধারণ করিয়া থাকি। অনেকক্ষণ যুবক যামিনীরঞ্জন বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে ভাবিয়া দেখিলেন, সময় তো বহিয়া চলিতেছে, দুই একটি পথিক যাঁহারা পথে চলিতেছেন, মল-মূত্রাচ্ছন্ন মুমূর্ষু অথবা মৃত এবং তাঁহার নিকট উপবিষ্ট যুবককে হয় তো কোনো আত্মীয় মনে করিয়া তাঁহারা দূর হইতেই চলিয়া যাইতেছেন। যামিনীরঞ্জন লোক-সমাগম দর্শন করিয়া ভাবিলেন, ইঁহাদেরই কাহারও কাছে ভিক্ষারূপ শেষ উপায় দ্বারা ইহার জীবনরক্ষা করিব। সেই মুহূর্ত্তেই পথের অপর পার্শ্বে জনৈক ভদ্রলোক দেখা দিলেন। বিগলিত-হৃদয়

করুণ-প্রাণ যামিনীরঞ্জন প্রাণের আবেগে মুহূর্ত্ত মধ্যে উঠিয়া সেই ভদ্রলোকের সম্মুখীন হইলেন ও হাত পাতিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়! আমাকে চারি আনা ভিক্ষা দিন্।" হঠাৎ একজন ভদ্রবংশীয় যুবকের এইরূপ ভিক্ষা প্রার্থনায় সেই ভদ্রলোকটি প্রথমে বিস্মিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু, পর-মুহূর্ত্তেই কি জানি কি ভাবিয়া, তিনি সেই যুবকের হস্তে একটি সিকি প্রদান করিয়া আপন গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। সেই পুণ্যমুহূর্ত্তেই তুইটি হৃদয়ের গভীর প্রেমস্বরূপ অর্ঘ্য আসিয়া বৃদ্ধার শিয়রে পতিত হইল। অর্থাৎ ভদ্রলোকটির দান এবং যামিনীরঞ্জনের সেবা। কে জানে সেই মহান্ দাতা কত গভীর প্রেমের অঞ্জলিস্বরূপ ঐ ষোল পয়সা দান করিয়া-ছিলেন—যাহা আজ ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া সমগ্র ভারত-ভূমিকে পরিব্যাপ্ত করিতে চলিয়াছে। তখন যামিনীরঞ্জন এই অর্থ দ্বারা কিঞ্চিৎ তুগ্ধ ক্রয় করিয়া আনিয়া বহু চেষ্টায় বৃদ্ধাকে পান করাইলেন এবং অতি সাবধানে তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী একটি বাটীর রোয়াকে শোওয়াইয়া দিলেন। তখন সবে-মাত্র প্রভাত-সূর্য্য সমস্ত নগরের উপরে আপনার কিরণরাশি ঢালিয়া দিতেছে। জন-কোলাহল যেন সমস্ত সহরখানিকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। তুগ্ধপানে ও যত্ন-শুশ্রূষায় এবং প্রভাত-বায়ুর স্পর্শে, রোগিণীও যেন ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া প্রাণ পাইতে লাগিলেন। যে জগৎ তাঁহার নিকট হইতে আর এক মুহূর্ত্ত পরেই শূন্য হইয়া

চলিতেছিল, বৃদ্ধা ঈষৎ চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন যে, সেই অস্পষ্ট জগৎ উত্তীর্ণ হইয়া আবার সেই দৃশ্যমান জগতে বারাণসী তেম্‌নি আনন্দময় হইয়া তাঁহার কাছে দেখা দিয়াছে। তখন যুবক যামিনীরঞ্জন বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া আনন্দের নিশ্বাস ফেলিলেন।

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। বৃদ্ধাও আপনাকে ক্রমে অধিকতর সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং ক্ষীণকণ্ঠে দুইটি একটি করিয়া কথাও কহিতে লাগিলেন। তখন যামিনীরঞ্জন ভাবিলেন, বোধ হয় অনশনই ইঁহার এই দুর্ব্বলতার কারণ; সুতরাং ইঁহার জন্য কিঞ্চিৎ অন্ন-পথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয় এবং বোধ হয়, অন্ন ভোজনের দ্বারা তাঁহার শরীরে বল সহজেই ফিরিয়া আসিতে পারে—এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিকটস্থ পুঁটিয়ারাণীর ছত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই ছত্রেই যামিনীরঞ্জন মধ্যাহ্নে অন্ন ভিক্ষা পাইতেন; ছত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি কর্ম্মকর্ত্তাকে বলিলেন, "আমার অন্ন আজ লইয়া যাইব।" ছত্রের নিয়ম, অভ্যাগত ছত্র-প্রাঙ্গণে বসিয়াই ভোজন করিবেন, স্থানান্তরে অন্ন লইয়া যাইবার বিধি নাই। সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহাকে অন্ন বাহিরে লইয়া যাইতে আপত্তি করিলেন—কিন্তু না-ছোড়বান্দা যুবক অন্ন লইয়া যাইবার জন্যই জেদ করিলেন। তিনি বলিলেন—"এই অন্ন আমি আজ নিজে ভোজন করিব না—উহা

পথিপার্শ্বে পতিতা এক জন অভুক্তাকে খাওয়াইব।” ইহা শুনিয়া কর্ম্মকর্ত্তা যুবকটিকে ব্যঙ্গোক্তি করিতেও ছাড়িলেন না। কিন্তু যামিনীরঞ্জন অনেক বাদানুবাদের পর ছত্র হইতে অন্ন লইয়া বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং অতি সতর্কতার সহিত বৃদ্ধাকে নিজ হস্তে তাহা ভোজন করাইলেন। তখন অনুমান বেলা ১০টা কি ১১টা। অন্ন-পথ্য পাইয়া বৃদ্ধা আপনাকে সত্যই বেশ সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার আত্ম-কাহিনী ধীরে ধীরে শুশ্রূষাকারী ঐ যুবকের নিকট অতি করুণভাবে বলিতে লাগিলেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ ঃ—

প্রায় মাসাধিক কাল পূর্ব্বে যশোহরের সুদূর পল্লীর অধিবাসিনী এই ভদ্র মহিলা পরমতীর্থ কাশীধামে জীবনের শেষ কাল অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া মাত্র একশত আটটি টাকা সম্বল লইয়া এই পুণ্যধামে আগমন করেন। তিনি আসিয়া ত্রিপুরাভৈরবী অঞ্চলে এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছু দিন গেলে যাত্রা করিয়া দর্শনাদির জন্য অনিয়মে, কঠিন রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্তা হইয়া তিনি সত্বরেই শয্যাশায়িনী হইলেন। তদবস্থায় চিকিৎসা ও নিয়মিত পথ্যের অভাবে রোগের প্রকোপ ভীষণ হইয়া পড়িল এবং তিনি অতিশয় ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। সেই সময় গৃহস্বামী ব্রাহ্মণ বৃদ্ধার ঐ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার আসন্ন ত্যু অনুমান করিলেন এবং এই মহাতীর্থক্ষেত্রে ঐ

ব্রাহ্মণের মনে লোভ ও ত্রাস জন্মিল। লোভের কারণ এই যে, বৃদ্ধার মৃত্যু হইলে তাঁহার অর্থগুলি অনায়াসে আত্মসাৎ করা যায়, আর ত্রাসের কারণ এই যে, এই প্রকার যাত্রীর মৃত্যু হইলে, যেখানে মৃত্যু হইয়াছে, পুলিস আসিয়া সেইখানে গৃহস্বামীর উপর বেওয়ারিস সম্পত্তির দাবি করিয়া জোর-জুলুম করিবে। সুতরাং লুব্ধ ও ভীত ব্রাহ্মণ আপন কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার ঐ উভয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায় করিলেন। তিনি একান্ত নিষ্ঠুরের মত বৃদ্ধাকে সেই অবস্থায় গঙ্গাতীরে ফেলিয়া রাখিয়া আসিলেন। বৃদ্ধার তখনও জ্ঞান ছিল বটে, কিন্তু, কথা বলিবার শক্তি ছিল না, কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না। একে দারুণ দুর্ব্বলতা, তাহার উপর এই আকস্মিক ব্যাপারে ভয়ে অভিভূত হইয়া তিনি যেন কেমন হইয়া গিয়াছিলেন,। তাহার পর কি হইল, তিনি কিছুই জানেন না। আবার যখন চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন—উপরে কেবল আকাশ—তাহাতে দুই একটি নক্ষত্র দেখা যাইতেছে—চারি দিক্ হইতে বাতাস আসিয়া হু-হু করিয়া গায়ে লাগিতেছে, তিনি কোথায়, কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না, কেবল কানের মধ্যে এক অব্যক্ত কুলু-কুলু ধ্বনি কোথা হইতে আসিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতেছে, এই মাত্র শুনিতে পাইতেছেন। ক্রমশঃ শরীর আড়ষ্ট হইয়া যেন তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতে লাগিলেন। দেহে অসীম যন্ত্রণা।

তখন তাঁহার মনের যে কি অবস্থা, তাহা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব। বৃদ্ধার নিকটে কেহই নাই, কাহাকেও ডাকিবার শক্তিটুকুও তাঁহার নাই। কেবল সেই কুলু-কুলু ধ্বনি তাঁহাকে যেন বলিয়া দিতেছে—'এখনও তুমি বাঁচিয়া আছ'।

সেই পবিত্র গঙ্গাতীরের মুক্ত বাতাসের মধ্য দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের করুণা তাঁহাকে পলের পর পল, দণ্ডের পর দণ্ড এবং প্রহরের পর প্রহর ধরিয়া ক্রমে চারিদিন পর্য্যন্ত বাঁচাইয়া রাখিল। ঐ অবস্থায় পরিত্যক্ত শবের মত বৃদ্ধা অন্তরের অস্পষ্ট অজ্ঞানতার মধ্যেও কোন্ মঙ্গল নাম জপ করিতেছিলেন, তাহা কে জানে! কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের সঞ্জীবন স্পর্শ আসন্ন মৃত্যুকে দূরে সরাইয়া ব্যাধি দূর করিয়া, বৃদ্ধার প্রাণ আবার তাঁহাকে ফিরাইয়া দিল। বৃদ্ধা বাঁচিয়া রহিলেন। কিন্তু, ঐ চারিদিনের মধ্যে একটি জন-প্রাণীও তাঁহার কোনো তত্ত্ব লয় নাই এবং আশ্চর্য্য এই যে, কোনো জনপ্রাণী তাহার কোনো অনিষ্টও করে নাই। এইরূপে অসহায় অবস্থায় নিরুপায় বৃদ্ধা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ও রোগ-যন্ত্রণায় একটুকু সাহায্যপ্রাপ্তির আশাতেই অতি কষ্টে পথের মাটি-পাথর আঁকড়াইয়া আঁকড়াইয়া হামাগুড়ি দিতে দিতে কোনোরূপে পুঁটিয়ারাণীর ছত্রের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু-কোটর ভরিয়া জল দেখা দিল; কৃতজ্ঞতায় তাঁহার

প্রাণ যেন যামিনীরঞ্জনের কাছে ঢলিয়া পড়িল; আর শুনিতে শুনিতে ঐ যুবকের নয়নবারিও বাধা মানিল না। তিনি বুঝিলেন যে, এই পুণ্যধামে যেমন অনন্ত পুণ্যের লহরী ছুটিয়া চলিয়াছে, সেইরূপ ভীষণ পাপের স্রোতও তাহারই পাশ দিয়া বহিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধার ঐ করুণ কাহিনী যুবকের অন্তর মধ্যে যেন জমাট মেঘের মত আবদ্ধ হইয়া কেবল অজস্র অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। বৃদ্ধাকে নানা প্রকারে বহু সান্ত্বনা প্রদান করিয়া, যামিনীরঞ্জন মধ্যাহ্ন-কালে তাঁহার আশ্রয়দাতা বন্ধু চারুচন্দ্রকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। চারুচন্দ্র ঐ বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে হর্ষ ও বিষাদে প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। বোধ হয় তিনি ভাবিতেছিলেন, এতদিনে বুঝি প্রিয়তম আরাধ্য দেবতা তাঁহার সাধনা-পথের অর্গল মুক্ত করিয়া দিয়া সহযাত্রীকে সত্যই আনিয়া দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয় মধ্যে কি যেন এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞার আলো জ্বলিয়া উঠিল। তিনি জানিতেন না, সে প্রতিজ্ঞার দিব্যজ্যোতিঃ কোন্ দেবতার পাদমূলে মঙ্গল-আরতি করিবে। চারুচন্দ্র তখন যামিনী-রঞ্জনকে বলিলেন, 'তুমি কিছু খাইয়া লও,—এখনই কেদার মৌলিকের বাড়ী যাইতে হইবে। তিনি আজ সকালে হরিদ্বার হইতে আসিয়াছেন।' বেলা তৃতীয় প্রহরে তাঁহারা কেদারনাথের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। যামিনী-রঞ্জনের মুখে বৃদ্ধার বৃত্তান্ত শুনিয়া কেদারনাথও স্তম্ভিত

হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে এই সংবাদ তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহাদের অনেকে কেদার-নাথের গৃহে মিলিত হইয়া বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তখনই তাঁহারা পরামর্শ করিয়া সঙ্কল্প করিলেন, একখানি ঘর ভাড়া লইয়া তাহাতে ঐ বৃদ্ধার সেবা-শুশ্রূষা করিবেন। ঘরের চেষ্টায় দুই এক জন চলিয়া গেলেন এবং দুই একজন ভেলুপুর হাঁসপাতালে গিয়া ডাক্তারবাবুর নিকট ঐ বৃদ্ধাকে হাঁসপাতালে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সহৃদয় ডাক্তারবাবু যুবকগণের এই কার্য্যে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইয়া বলিলেন, "আপনারা যদি উঁহার খোরাকীর জন্য ৪৲ চারি টাকা জমা দিতে পারেন, তাহা হইলে রোগিণীকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিতে পারিব। খোরাকী ছাড়া কোন রোগীকে ভর্ত্তি করার নিয়ম এখানে নাই, সুতরাং উহা আমার সাধ্যাতীত।" অগত্যা যুবকগণ বৃদ্ধার জন্য কিছু ঔষধ লইয়া তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেদিন বহু চেষ্টাতেও একখানি ঘর পাওয়া গেল না এবং হাঁসপাতালেও স্থান মিলিল না। সুতরাং তাঁহারা ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া স্থির করিলেন, গ্রীষ্মকাল— সুতরাং অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গা হইলেও বৃদ্ধার প্রাণ-হানির আর সম্ভাবনা নাই। অবশেষে সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সেই রাত্রির মত নিতান্ত দুঃখের সহিত নিকটবর্ত্তী একটি পতিত বাড়ীর খোলা বারান্দায় বৃদ্ধাকে আনিয়া শোওয়াইলেন এবং

তাঁহারা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তথায় রহিলেন, পরে আপন আপন বাসস্থানে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু অতিবাহিত করিয়া আবার প্রভাতে সকলে বৃদ্ধার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আবার বিশ্বনাথের জয়গানে দশদিক্ মুখরিত করিয়া তখন জনপ্রবাহ সহরখানিকে জাগাইয়া তুলিতেছিল এবং সূর্য্যনারায়ণও সমুজ্জ্বল আলোকে শুচি, অশুচি, দয়াল, নির্ম্মম, দাতা, দুঃখী প্রভৃতি সকল বিচিত্রতাকে প্রকাশ করিয়া তুলিতেছিলেন। সেই সময় একটি রুগ্না বৃদ্ধার পার্শ্বে অনেকগুলি ভদ্রবংশীয় যুবককে একত্র দেখিয়া, পণ্ডিত শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তথায় উপস্থিত হইয়া কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা এত লোক এখানে দাঁড়াইয়া আছেন কেন ?” তাঁহার এই কথায় যুবকগণের চমক ভাঙ্গিল ; তাঁহারা পরস্পরে কথা বন্ধ করিয়া আগন্তুকের দিকে চাহিলেন এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধার বিষয় আদ্যোপান্ত সংক্ষেপে বলিলেন। দয়ালহৃদয় পণ্ডিত মহাশয় ঐ করুণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—“আপনারা উপস্থিত উহাকে হাঁসপাতালে দিন্।” উত্তরে যুবকগণ জানাইলেন, “উহার খোরাকীর জন্য ৪৲ চারি টাকা জমা না দিলে হাঁসপাতালে ইহাকে গ্রহণ করিবে না।” এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় যুবকগণের হাতে একটি টাকা প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে অশেষ ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রস্থান করিলেন। তখন যুবকগণ স্থির করিলেন, আর ৩৲ তিন

টাকা সংগ্রহ করিয়া বৃদ্ধাকে হাঁসপাতালে দেওয়াই উপস্থিত কর্ত্তব্য। তখনই ঐ যুবকসঙ্ঘের কয়েকজন বাকী তিনটি টাকা ভিক্ষাদ্বারা সংগ্রহ করিতে চলিয়া গেলেন এবং অন্যান্য সকলে বৃদ্ধাকে তুলিয়া লইয়া নিতান্ত দুঃখের সহিত ভেলুপুর হাঁসপাতাল অভিমুখে চলিলেন। ইতিমধ্যে বাকী তিনটি টাকাও সংগৃহীত হইল; সর্ব্বসমেত ৪৲ চারি টাকা দিয়া তাঁহারা বৃদ্ধাকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন এবং তথায় যুবকসঙ্ঘের অক্লান্ত চেষ্টায় বৃদ্ধার সেবাশুশ্রূষা সুন্দর-ভাবে চলিতে লাগিল। সেই দিন ঐ যুবকগণের হৃদয়-মন্দিরে সেবাব্রতের মঙ্গল ঘট স্থাপিত হইল, সেই দিন হইতে শ্রীশ্রীবারাণসীধামের পুণ্যক্ষেত্রে—অদ্বৈতজ্ঞানের সিদ্ধ-পীঠে জীবসেবারূপ শিব-পূজার জন্য নূতনভাবের পূজাঞ্জলি বর্ষিত হইতে লাগিল। ঐ বৃদ্ধার নাম ছিল নৃত্যকালী দাসী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যামিনীরঞ্জনের বন্ধুগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন চারুচন্দ্র, আর ছিলেন নির্ম্মলহৃদয় কেদারনাথ, হরিনাথ, ব্রহ্মচারী নিগমাচারী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, হরিদাস এবং জগৎদুর্লভ।

জীবনের কোন এক পুণ্যমুহূর্ত্তে অল্পবয়সেই নির্জ্জনে ভগবদারাধনার জন্য চারুচন্দ্রের মন ব্যাকুল হইয়াছিল, কিন্তু সে ব্যাকুলতা তিনি তাঁহার একার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। বাল্যবন্ধু শচীন্দ্রনাথ এবং মন্মথনাথ প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া সেই সময় হইতেই চারুচন্দ্র ভগবদ্‌ভজনের বিপুল আনন্দ-স্রোতে অবগাহন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতময়ী উপদেশমালা এবং শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর ত্যাগ ও বৈরাগ্যোদ্দীপক অগ্নিগর্ভ বাণীসমূহ পাঠ করিতে করিতে তাঁহাদের হৃদয়-তন্ত্রীতে অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা বাজিয়া উঠিত। এই সঙ্গীতের ভাবরাশি চারুচন্দ্রই প্রথমে হৃদয়ে বহন করিয়া পুণ্যক্ষেত্র কাশীধামে আনয়ন করেন এবং সেই সঙ্গে স্কন্ধে বহন করিয়া তিনি আনিয়াছিলেন—ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের আসনোপরি উপবিষ্ট—ভাববিভোর—পবিত্র ও শান্ত মূর্ত্তিখানির চিত্রপট। চারুচন্দ্র যেদিন জীবনে প্রথম শ্রীমৎ স্বামীজীর শ্রীমুখের বাণী সাক্ষাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই

দিনেই তাঁহার হৃদয়ের সলিতাতে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দের প্রথম প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রদীপের উজ্জ্বল আলোক তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যের অন্ধকার নাশ করিয়া, শুধু যে তাঁহাকেই ধন্য করিয়াছিল, তাহা নহে,—তাঁহার প্রিয় বন্ধুগণকেও সেই দীপের স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল আলোকে তিনি আলোকিত করিয়া দিয়াছিলেন।

দিনের পর দিন যেমন চলিয়া যাইতে লাগিল, চারুচন্দ্রও তেমনি অপরের অজ্ঞাতভাবে নিজের হৃদয়ের মধ্যে আপন জীবনের গন্তব্য পথ দেখিতে পাইলেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে চারুচন্দ্র রিপন কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন। তখনই তিনি বুঝিলেন, এই অর্থকরী বিদ্যা শিখিবার তাঁহার কোন আবশ্যকতা নাই। তাই তিনি কলেজের পড়াশুনা পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্মচর্চ্চায় দিন অতিবাহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন নবীন ভারতের মহাসিদ্ধপীঠ—শ্রীশ্রীভবতারিণীক্ষেত্র—দক্ষিণেশ্বরের মনোরম তপোবনে, প্রতি মঙ্গলবারে তিনি আপন ব্যাকুল হৃদয়খানি লইয়া উপস্থিত হইতেন এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতা ভবতারিণীর দর্শন ও অর্চ্চন এবং সমাগত ভক্তমণ্ডলীর সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশাদির আলোচনায় যোগদান করিতেন। সুযোগ উপস্থিত হইলেই তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত সদলবলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য মহাত্মা রামচন্দ্রের ভাবগম্ভীর বক্তৃতাবলী

শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। শুধু তাহাই নহে, যেমন ঐ তপোবন-ভূমিতে তিনি গিয়া প্রাণ জুড়াইতেন, তেমনি কোলাহলপূর্ণ মহানগরী কলিকাতাতেও আর একটি আনন্দধামও সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, সেটি ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবমণ্ডিতচরিত্র—মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের পবিত্র ভবন। গোস্বামীজী তখন হ্যারিসন্ রোডে বাস করিতেন। তাঁহার আবাস-নিকেতনে নিত্য ভাগবত-গ্রন্থ পাঠ এবং মধুর নাম-সংকীর্ত্তন হইত। চারুচন্দ্র প্রায়ই ঐ পবিত্র স্থানে গমন করিতেন এবং ভগবৎ-প্রসঙ্গ ও নাম-সংকীর্ত্তন শ্রবণে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন।

চারুচন্দ্রের পড়াশুনা পরিত্যাগ এবং এইরূপ উদাসীন ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার স্নেহময় জনক ও জননী তাঁহাকে বিবাহ দিয়া সংসারী করিতে যত্নশীল হইলেন। কিন্তু ঐ প্রস্তাবে চারুচন্দ্র এমন তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিলেন যে, তৎ শ্রবণে অতঃপর তাঁহার মাতা, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি কেহই বিবাহের প্রস্তাব আর তাঁহার নিকট করেন নাই। অগত্যা তাঁহাকে তাঁহারা 'মেসার্স সোইন হো এণ্ড চন্দ্র' নামক এটর্নি অফিসে একটি কেরাণীর চাকুরিতে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। চারুচন্দ্র দেখিলেন, ইহা মন্দ নহে। এখন আর কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকিতে হইবে না। তিনি চাকুরি লইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতৃভবনের সন্নিকটে একটি পৃথক্ ঘর ভাড়া করিয়া, তথায় বাস করিতে

লাগিলেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে বহুপরিবারভুক্ত বাটিতে বাস করিয়া তিনি সাধন-ভজনের বিশেষ ব্যাঘাত অনুভব করিতেছিলেন। এইবার তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে একটি ঘর ভাড়া লইলেন। এই খানেই তিনি বাস করিতেন, মাত্র দুই বেলা জননীর নিকট ভোজন করিতে যাইতেন এবং ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অফিসে কার্য্য করিতেন, আর সন্ধ্যায় ও প্রভাতে ধ্যান ও ধারণায় মনোনিবেশ করিতেন। রাত্রিকালে সদ্‌গ্রন্থ পাঠ এবং বন্ধুবর্গের সহিত তাহার আলোচনায় ও অনুশীলনে তাঁহার সময় সুখে অতিবাহিত হইতে লাগিল। ইহা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের কথা।

এইরূপে দিন কাটিয়া যাইতেছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সভ্য-জগতের হৃদয়-রাজ্য-জয়ী আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী প্রথম আমেরিকা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনিই পাশ্চাত্য সভ্য-জগতের নিকট ভারতের ধর্ম্মরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। জগতের ধর্ম্মপিপাসু জনগণের মানস সেই মুক্ত দ্বারপথের অভিমুখে ছুটিবার জন্য ব্যাকুলতার সাড়া দিতেছিল। চারুচন্দ্রের আনন্দ-মগ্ন মনের স্পন্দনও সেই কম্পনের সঙ্গে মিলিত হইয়া যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। ইউরোপ হইতে ফিরিয়া স্বামীজী যেদিন প্রথম কলিকাতায় আগমন করেন, সেইদিনেই সর্ব্বপ্রথম স্বামীজীর দর্শন লাভে তিনি

কৃতার্থ হন। সেই দিন যখন তিনি স্বামীজীর যান হইতে অশ্বগুলি খুলিয়া দিয়া তাঁহার গাড়ীখানিকে বহুজনের সহিত একত্রে টানিতেছিলেন, তখন চারুচন্দ্রের মনে হইতেছিল—'এই ত সেই বিশ্বপ্রাণ শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথখানি আমি টানিতেছি'। সেদিন তাঁহার জীবনের যে কি পরমানন্দের দিন এবং তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্মারম্ভের কোন্ পরম শুভক্ষণ, তাহা বলিয়া বুঝান যায় না। স্বামীজীর সেই দর্শন, তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ এবং পর দিবস আলমবাজার মঠে তাঁহার পুনর্দর্শনের পর তাঁহার কৃপা-কটাক্ষ ও আশীর্ব্বাদ লাভে, চারুচন্দ্রের হৃদয় ঈপ্সিত রাজ্যের কোন্ সীমানায় যে ধাবিত হইতে লাগিল, তাহার নির্ণয় সেদিন তিনি নিজেই করিতে পারেন নাই। কিন্তু চারুচন্দ্র অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন তাঁহার জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র হয়ত আর সাধারণ পথে চলিবে না। তিনি দেখিলেন, এটর্নি অফিসের কার্য্যের বাঁধনটি তাঁহাকে যেন সংসারের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে। যতই সে কাজের বাঁধন শক্ত হইতেছিল, ভিতরে ভিতরে তাঁহার মনের বাঁধনও ততই খুলিয়া যাইতেছিল।

তিনি তাঁহার দৈনিক কঠোর কাজের ফাঁকে ফাঁকে আপনার ধর্ম্ম-জীবন গঠনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কর্ম্মের এই কঠিন বন্ধন তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনে বাধা না দিয়া বরং সহায়তাই করিয়াছিল। তিনি দিবারাত্রি

কর্ম্মের শৃঙ্খল বহন করিয়াও তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্মের জয়গান অন্তরে অন্তরেই গাহিতেছিলেন। কর্ম্মের অবসরে বন্ধুজনকে লইয়া কখনও বিরলে, কখনও নিশীথ রজনীর সংকীর্ত্তনে, কখনও সৎসঙ্গের সংস্পর্শে সে শৃঙ্খলের গ্রন্থিগুলিকে ক্রমে ক্রমে অলক্ষ্যে শিথিল করিয়া তুলিতেছিলেন।

সেই সময় বরাহনগরের অপর পারে বেলুড়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপিত হইল। ভারতের আকাশে জগদুদ্ধারের জন্য নবোদিত আলোক সূর্য্য-কিরণের সহিত মিলিত হইয়া যে নবজীবনের সূচনা করিয়াছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই পবিত্র গঙ্গাতীরে পবিত্রপ্রাণ ভক্তগণের আরাধনার মন্দিরও সংস্থাপিত হইল। তথাকার পূজার আনন্দ-শঙ্খধ্বনি গঙ্গাতীর প্রতিধ্বনিত করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সমস্ত দিবস-রজনীই সেই আনন্দ উল্লাস-কোলাহলে মুখরিত হইতেছিল। যে ধ্যান, যে ধারণা, যে আত্মপ্রসাদের বিশুদ্ধ পুষ্পাঞ্জলি সেই মন্দির-দেবতার উপাসনায় নিত্য সমর্পিত হইত, তাহা জগতের চিরন্তন সত্যের শিশির-মাখা পদ্মেরই মত ; অনেক ভ্রমরই সেই পদ্মের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া দিনে দিনে সেখানে আসিয়া জুটিতেছিল ; সৌরভলুব্ধ চারুচন্দ্রও একটি ক্ষুদ্র ভ্রমরের মতই কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে, সেই পদ্মসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া সেই মহাতীর্থের মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া

উপস্থিত হইলেন এবং আপনার হৃদয়খানি লইয়া লুটাইয়া পড়িলেন। আর তাঁহার বাল্যবন্ধু তেম্‌নি ব্যাকুলপ্রাণ শচীন্দ্রনাথও তাঁহারই মত ব্যাকুলতার সহিত তথায় ছুটিয়াছিলেন। তথাকার সাধুসঙ্গ তাঁহাদিগের তৃষিত হৃদয়-মরুতে যেন সুধা বর্ষণ করিতেছিল। সাধুজীবনের উপকারিতা, সজ্জনের উপদেশ-মালার আলোচনা এবং সচ্চিদানন্দের ধ্যান ও ধারণা প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রসঙ্গে তাঁহারা বড়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। তাঁহাদিগের চিত্তের অঙ্গনের আবর্জ্জনারাশি ক্রমে অপসারিত হইতে লাগিল। তাঁহাদের মন-প্রাণ অমল ত্যাগ-বৈরাগ্যের সহায়ে ভগবদারাধনার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিল এবং হৃদয়ে মহতী আশার দীপশিখাটি ক্রমেই উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। দিন চলিতেছিল, দিনের পর দিন অধ্যাত্ম-স্রোতের ধারায়, আনন্দের লহরী মাখিয়া একটি বর্ষ এইভাবে অতিবাহিত হইল। তখন চারুচন্দ্র ২৩।২৪ বৎসরের যুবক মাত্র।

ইছাপুর নামক ২৪ পরগণার অন্তর্গত ক্ষুদ্র সহরের অধিবাসী ছিলেন শ্রীযুক্ত শ্যামাশঙ্কর দাস মহাশয়। চারুচন্দ্র তাঁহার চতুর্থ সন্তান। শ্যামাশঙ্কর দাস মহাশয় ৩১নং মুসলমান-পাড়া লেনে বাস করিতেন। তাঁহার পাঁচটি পুত্র ছিল। প্রথম প্রসন্নকুমার, দ্বিতীয় গোপালচন্দ্র, তৃতীয় শরৎশঙ্কর, চতুর্থ চারুচন্দ্র এবং পঞ্চম অতুলচন্দ্র।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে শ্যামাশঙ্কর বাবু সস্ত্রীক কাশীধামে শেষ-জীবন অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিয়া, বারাণসী অভিমুখে

যাত্রা করেন। সেই সময় চারুচন্দ্র চিন্তা করিয়া বুঝিলেন—ইহাই সুবর্ণ-সুযোগ উপস্থিত, পিতামাতার সহিতই কাশীগমন করিতে হইবে। এই সঙ্কল্পে তাঁহার মনও প্রসন্ন হইয়া উঠিল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই দিনেই এটর্নি অফিসের কর্ম্মটি পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গ বুঝিলেন না—এইরূপ তিনি কেন করিলেন। চারুচন্দ্র তৎপরতার সহিত আপনার পুস্তকাদি এবং আরাধ্য-দেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামীজীর চিত্রপট দুইখানিও সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ মাতা-পিতার সেবা ও তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত তাঁহাদিগের সাথী হইলেন।

কাশীধামে আসিয়া চারুচন্দ্রের দিন কি প্রকার আনন্দে অতিবাহিত হইতেছিল তাহা তিনিই জানেন। সেই সময় তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য ছিল—প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া খানিকক্ষণ তিনি সাধনভজনে অতিবাহিত করিতেন। তৎপর মাতা ও পিতার আবশ্যক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইতেন। স্নানান্তে মন্দিরে দেবতাদির দর্শন ও প্রদক্ষিণ করিয়া বাড়ী ফিরিতেন। তৎপর আহারাদি করিয়া বিশ্রামান্তে অপরাহ্নে ভ্রমণে বাহির হইতেন। তাঁহার ভ্রমণের স্থান ছিল ৺গঙ্গাতীর, ভিন্ন ভিন্ন দেবালয় এবং সাধু-সজ্জনগণের আশ্রম প্রভৃতি। দর্শনাদিতে চারুচন্দ্রের একটি বিশেষত্ব ছিল, তিনি দর্শনীয় বস্তু, মন্দিরাদি এবং সাধু-সন্ন্যাসিগণের ঐতিহাসিক তত্ত্ব এবং মহাপুরুষগণের

উপদেশাদি ও কার্য্যকলাপের উপর বিশেষ লক্ষ্য করিতেন। ইহা দ্বারা তিনি প্রত্যেক স্থান হইতেই বিশেষ অভিজ্ঞতা-লাভে সমর্থ হইতেন। এইরূপে ভ্রমণকালে সহসা একদিন পথে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী স্বামী শুদ্ধানন্দ মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি সবেমাত্র কয়েকদিন হইল, কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শন করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছেন। সেই দিন তিনি মাধুকরী ভিক্ষায় বহির্গত হইলে চারুচন্দ্রের সহিত তাঁহার পথে সাক্ষাৎ হয়। চারুচন্দ্র তাঁহাকে দেখিবামাত্র অভিবাদন করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। শুদ্ধানন্দ একটি অপরিচিত যুবকের এইরূপ আত্মীয়োচিত প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসায় প্রথমেই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, আমি ত আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না।" উত্তরে চারুচন্দ্র বলিলেন,—"আপনি একদিন কলিকাতায় বৈঠকখানা রোডে পাঁচু খানসামার লেনে আমার আবাস-কুটীরে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ বাবুর সহিত গিয়াছিলেন। তখন আপনি সন্ন্যাসী হন নাই।" শুদ্ধানন্দজীর তখন মনে পড়িল এবং তিনি বিস্মিত হইলেন যে, লোকটির কি প্রবল স্মরণ-শক্তি! তখন শুদ্ধানন্দজী বলিলেন,—"হাঁ, মনে পড়িয়াছে। ঠাকুরের ভক্ত ক্ষীরোদ বাবু আমাকে একদিন একটি ভক্ত দেখাইবার নিমিত্ত আপনার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল। আমরা গিয়া দেখিলাম, আপনি ঠাকুর

ও স্বামীজীর চিত্রপটের সম্মুখে নিশ্চলভাবে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। আমাদের সাড়া পাইয়া আপনি উঠিয়া আমাদিগকে বসাইয়াছিলেন এবং আপনার মাতাঠাকুরাণী কর্ত্তৃক প্রেরিত পিষ্টকাদি মিষ্টান্ন ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া আমাদিগকে প্রসাদ দিয়াছিলেন। প্রসাদ গ্রহণান্তে আমরা আপনার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই একদিনের কিছুক্ষণের আলাপ-পরিচয়ে আপনি আমাকে এখনও মনে করিয়া রাখিয়াছেন, ইহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।" অতঃপর দুইজনে চলিলেন। পথে উভয়ের মধ্যে কৈলাস ও মানস সরোবরের অনেক কথা হইল। এইরূপে অন্তর ও বহিঃশুদ্ধ শুদ্ধানন্দ—সরলচিত্ত ও মধুরভাষী চারুচন্দ্রের সহিত বাক্যালাপে বিশেষ প্রীত হইলেন। শুদ্ধানন্দজী বলিলেন,—"সোনারপুরা বংশী দত্তের বাটীতে পূজনীয় নিরঞ্জনানন্দ মহারাজ রহিয়াছেন—আমি তাঁহারই কাছে আছি।" অতঃপর মাধুকরী গ্রহণান্তে শুদ্ধানন্দজী বংশী দত্তের বাটীতে চলিয়া গেলেন এবং চারুচন্দ্র আপন জননীর নিকট আসিয়া আহারান্তে অপরাহ্ণে তথায় তাঁহাদের সহিত আবার মিলিত হইলেন। কয়েকদিন তাঁহাদিগের সহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ও অন্যান্য সৎপ্রসঙ্গে আনন্দে কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে শুদ্ধানন্দজী জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। চারুচন্দ্র তখন তাঁহার ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা এবং সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহু চেষ্টাতেও

শুদ্ধানন্দজীর জ্বর নিবৃত্ত হইল না। এই কারণে পূজ্যপাদ নিরঞ্জনানন্দজী কোন একটি ভাল স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনার্থে তাঁহাকে পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু কোথাও তেমন সুবিধা না হওয়ায় এবং কলিকাতা হইতে পূজ্যপাদ সারদানন্দজী পুনঃপুনঃ আহ্বান করায় শুদ্ধানন্দজী কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন। ইহা ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগের কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণমঠ হইতে "উদ্বোধন" নামক পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উহার প্রচারের জন্য স্বামী শুদ্ধানন্দজী চারুচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া একখানি পত্র এবং কয়েকখানি "উদ্বোধন" নমুনা-স্বরূপ প্রেরণ করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের মুখপত্র উদ্বোধনের গ্রাহক সংগ্রহের জন্য চারুচন্দ্র বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এই উপলক্ষেই চারুচন্দ্রের সহিত ধর্ম্ম-প্রাণ ও পূত-চরিত্র যুবক হরিনাথের পরিচয় সংঘটিত হয়। হরিনাথের ধর্ম্ম-বন্ধু ছিলেন কেদারনাথ। কেদারনাথের গৃহে একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী ছিল। হরিনাথ তাঁহাকে "উদ্বোধনের" গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করেন এবং প্রথম সংখ্যা "উদ্বোধন" তাঁহাকে প্রদান করেন। কেদার-নাথ উহাতে স্বামীজীর লিখিত প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া হরিনাথকে বলিলেন "আমি উহা লইব না; ইহার ভাষা বড় কট্‌মটে—ইহাতে কিছুই নাই।" হরিনাথ এই কথাগুলি চারুচন্দ্রের কাছে আসিয়া বলিলেন এবং "উদ্বোধন"-খানি ফিরাইয়া দিলেন। তাহা শুনিয়া চারুচন্দ্র সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন ও বলিলেন,—"কি! স্বামীজীর লেখাতে কিছু নাই? তাঁহার ভাষা কট্‌মটে? যিনি এই কথা বলেন

তিনি পড়িতে জানেন না। আমি সেই লোকটিকে দেখিতে চাই এবং তাঁহাকে ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইতে চাই।” চারুচন্দ্রের এইরূপ উত্তেজনাপূর্ণ কথায় নিরীহ প্রকৃতির হরিনাথ মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। শেষে অগত্যা তাঁহাকে লইয়া কেদারনাথের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বালব্রহ্মচারী, দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ এবং পূতচরিত্র কেদারনাথ তখন পুলিস্ অফিসে শিক্ষানবিশ ছিলেন। তাঁহার তখন জীবনের লক্ষ্য ছিল—সহর কোতয়াল বা দারোগা হইয়া, অশ্বারোহণে কোমরে তরবারি ঝুলাইয়া, সহরে দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করিবেন। হরিনাথ যখন চারুচন্দ্রকে তাঁহার নিকট লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং চারুচন্দ্রের কথা তাঁহাকে শুনাইলেন, তখন কেদারনাথ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “এই ত ক্ষীণজীবী তালপাতার সিপাই; তার আবার এত গর্ব্ব!” প্রকাশ্যে তিনি চারুচন্দ্রকে বলিলেন,—“আপনি আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় আসিবেন; আপনার নিকট হইতে ‘উদ্বোধনের’ প্রস্তাবনা পাঠ শুনিব।” পর দিবস সন্ধ্যার সময় চারুচন্দ্র ও হরিনাথ, কেদারনাথের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি ও কয়েকজন ভদ্রলোক তথায় বসিয়া সংবাদ-পত্রাদি পাঠ করিতেছেন। কেদারনাথ চারুচন্দ্রকে দেখিয়াই সাদরে আহ্বান করিলেন এবং উপস্থিত সকলের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় করাইয়া দিয়া তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জানাইলেন। তখন চারুচন্দ্র ধীরে ধীরে ‘উদ্বোধন’

খানি বাহির করিয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ মধুর ছন্দে, ধীর ও গম্ভীর ভাবে প্রস্তাবনাটি পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি আপন ভাবেই বিভোর হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার পাঠ শেষ হইলে তাঁহাকে সকলে অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আর সরলপ্রকৃতি ও শুদ্ধচিত্ত কেদারনাথ, চারুচন্দ্রের নিকট ক্ষমা চাহিয়া অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং তখনই তিনি তাঁহার পিতামহ রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয়ের নামে "উদ্বোধনে"র গ্রাহক হইলেন এবং একখানি "রাজযোগের" জন্য পত্র লিখিলেন। এইরূপে কেদারনাথ, হরিনাথ এবং চারুচন্দ্রের মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিতে লাগিল ; এবং সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট এই বন্ধুত্রয় প্রায়ই কেদারনাথের গৃহে উপস্থিত হইয়া কখনও ধর্ম্মপ্রসঙ্গে, কখনও সদালাপে এবং কখনও মহৎ জীবনের আলোচনায় একান্ত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

নদী যেমন চলিতে চলিতে কত উপনদীকে আপনার অন্তর্গত করিয়া লয়, তেমনই এই তিনটি যুবকের সঙ্গে আরও কয়েকটি সরলচিত্ত যুবক আসিয়া মিলিত হইলেন। একই ভাবের এই কয়টি জীবনের আনন্দময় কর্ম্মপ্রবাহ কোন্ এক অব্যক্ত মহাসাগরের অভিমুখ হইয়া ছুটিতেছিল। সে মহাসাগরের সন্ধান তাঁহাদিগকে কে দিবে, তাঁহারা তখনও তাহা জানিতেন না। কেদারনাথের গৃহে মিলিত হইয়া দিনের পর দিন তাঁহারা মহাকবি গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

পাঠ, ধর্ম্ম ও দর্শন কথা, কত কত মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী আলোচনা করিয়া ধন্য হইতেছিলেন। তাঁহাদিগের হৃদয় ক্রমশঃ নির্ম্মল আনন্দরসে তন্ময় হইয়া উঠিতেছিল। চারুচন্দ্রই নিত্য পাঠক এবং বক্তার আসন গ্রহণ করিতেন। পাঠে ও কথোপকথনে তাঁহার ঈশ্বরদত্ত অদ্ভুত শক্তি ছিল। এই কারণে পাঠে এবং বাক্যালাপে তিনি বন্ধুগণকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। ক্রমে চারুচন্দ্র তাঁহার বন্ধুগণের হৃদয়ে জমিয়া বসিলেন। তাঁহারা তখন একদিনের জন্যও চারুচন্দ্রের বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না। চারুচন্দ্রের সঙ্গ এবং চারুচন্দ্রের বাক্যালাপ তাঁহাদিগের চিত্তকে মধুরতর করিয়া তুলিতে লাগিল।

সেই সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদগণের অন্যতম শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী কাশীধামে শুভাগমন করিয়াছিলেন। চারুচন্দ্র এই সংবাদ বন্ধুগণকে দিলেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'নিরঞ্জনানন্দ মহারাজজীকে একদিন এখানে আনিয়া ঠাকুরের কথা শুনিলে হয় না?' এই প্রস্তাবে বন্ধুগণ সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, চলুন,—তাঁহাকে আমরা এখানে লইয়া আসি।" ইঁহাদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন কেদারনাথ, কারণ তাঁহারই বাটীতে স্বামীজীকে নিমন্ত্রণ করা হইবে। চারুচন্দ্র বন্ধুগণকে উক্ত স্বামীজীর পবিত্র সঙ্গলাভে সৌভাগ্যবান্ করিবার জন্যই এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পর দিবস তাঁহারা পূজনীয় নিরঞ্জনানন্দজীকে

আমন্ত্রণ করিয়া কেদারনাথের গৃহে লইয়া আসিলেন। ত্যাগ-বৈরাগ্যের জ্বলন্ত আদর্শ এবং ভক্তিপ্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি স্বামী নিরঞ্জনানন্দের পূত সঙ্গলাভে এই তরুণ যুবক-সঙ্ঘের আধ্যাত্মিক ভাব অধিকতর সুগভীর হইয়া উঠিল। ইহার কয়েকদিন পরেই ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-উৎসবের দিন। চারুচন্দ্র কেদারনাথের নিকট প্রস্তাব করিলেন, ঠাকুরের তিথি-পূজার মাত্র দুই দিন বাকী আছে, এবার আপনার বাড়ীতে নিরঞ্জন মহারাজের দ্বারা ঠাকুরের তিথি-পূজা সম্পন্ন করিলে হয় না? কেদারনাথ উত্তর করিলেন, "বেশ ত।" ক্রমে এই প্রস্তাব উক্ত স্বামীজীর নিকট করা হইল। গুরুপ্রাণ শিষ্য নিরঞ্জনানন্দজী যুবকগণের এই প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মতি দান করিলেন। তখন কথা উঠিল ঠাকুরের চিত্রপট কোথায় পাইব? চারুচন্দ্র বলিলেন, "তজ্জন্য ভাবিতে হইবে না। ইতিপূর্ব্বেই তিনি আমার স্কন্ধে চাপিয়া কাশীধামে আসিয়াছেন। আগামী কল্য আমি তাঁহাকে এই স্থানে স্থাপন করিয়া যাইব।" চারুচন্দ্রের এই রহস্য-মাখা সত্য কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। বোধ হয় তাঁহারা তখন চারুচন্দ্রের অন্তরের নিগূঢ় ভাব বুঝিতে পারেন নাই। চারুচন্দ্রই কি তখন তাঁহার মুখ দিয়া যে ধ্রুব সত্যকথা প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন? পরদিবস প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া চারুচন্দ্র ঠাকুরের চিত্রপটখানি (যাহা

তিনি কলিকাতা হইতে সযত্নে কাশীতে আনিয়াছিলেন) অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে কেদারনাথের গৃহে আনিয়া স্থাপন করিলেন। কেদারনাথ তখনই সর্ব্বপ্রথম ঠাকুরের চিত্রপট দর্শন করিলেন। দর্শন করিবামাত্র তাঁহার প্রাণ যেন ভাবে আকুল হইয়া উঠিল। তিনি যেন প্রাণে প্রাণে বোধ করিতে লাগিলেন—ঠাকুরই তাঁহার একমাত্র পরম আশ্রয় এবং পরম সুহৃদ্। ভাবপ্রবণ কেদারনাথ আপন ভাবের আতিশয্যে ঠাকুরের উদ্দেশে পুনঃপুনঃ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন।

পর দিবস প্রত্যূষে পূজ্যপাদ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমবেত যুবকগণ তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামপূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন এবং ঠাকুর-পূজার নিমিত্ত কেহ ফুল, কেহ বিল্বদল, কেহ বা পবিত্র জাহ্নবীবারি বহন করিয়া লইয়া আসিতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ ফল-মূল মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোগরাগের বন্দোবস্তে নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে পূজার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। নিরঞ্জনানন্দজী অতি-সন্তর্পণে গুরুপূজার আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পূজা সমাপনান্তে প্রসাদাদি সমবেত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হইল। অপরাহ্ণে পরমহংস দেবের কথা-প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল এবং তৎপর দুই একজন সুগায়ক দ্বারা কীর্ত্তনাদি হইল। এইরূপে প্রথম কাশীধামে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চারুচন্দ্রের স্কন্ধে চাপিয়া আপন প্রিয় শিষ্য কর্ত্তৃক

পূজিত হইয়া কেদারনাথের গৃহে নিজ আসন স্থাপন করিলেন।

ইহার কিছু কাল পরে পূজ্যপাদ বিবেকানন্দজীর অন্যতম শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দজী কাশীধামে আগমন করেন এবং কেদারনাথের গৃহেই অতিথি হইলেন। তিনিও এই যুবক-সঙ্ঘের সহিত "আত্মনোমোক্ষার্থে জগদ্ধিতায় চ" স্বামীজীর এই মহতী বাণী সম্বন্ধে বহুতর আলোচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে সেবাব্রতে অনুপ্রাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ধ্যান-পরায়ণ যুবকগণের মধ্যে কর্ম্মোন্মাদনা তখনও আসে নাই। এইরূপে দিন চলিতে লাগিল, ক্রমে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দজীর চরিত-কথা এবং উপদেশমালা তাঁহাদিগের প্রধান আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িল। সেই আলোচনা-কুসুমকলিকার অভ্যন্তরে মধুর ন্যায় সহসা তাঁহাদের অন্তঃকরণকে অতি আশ্চর্য্য আনন্দ-রসে সুবাসিত করিয়া তুলিল। কেন যে তাঁহারা এই আলোচনায় এমনভাবে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, তাহা তাঁহারা নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেন না। স্বামীজীর "জ্ঞানযোগ"-নামক পুস্তক সেই সময় কেদারনাথের গৃহে চারুচন্দ্র পাঠ করিতেছিলেন। পূর্ণিমাচন্দ্রের জ্যোৎস্না যেমন এক অতি-গভীর স্নিগ্ধরসে মানবের হৃদয়-কন্দর ডুবাইয়া দেয়, চারুচন্দ্রের পঠিত জ্ঞানযোগের অংশগুলি যেন সেইরূপ তাঁহাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ডুবাইয়া দিয়া হৃদয়কে একান্ত

প্রসন্ন করিয়া তুলিল। ঠিক সেই সময় আবার চারুচন্দ্রের বাল্যবন্ধু শচীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে বেলুড় মঠে নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করিতেন। তথায় তিনি যে সকল সৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেন, তাহা প্রতি সপ্তাহে পত্রদ্বারা চারুচন্দ্রকে জ্ঞাপন করিতেছিলেন। চারুচন্দ্র সেই সকল পত্র কাশীর বান্ধব সকলকে পাঠ করিয়া শুনাইতেছিলেন। এইরূপ সুবিধা এবং পুণ্য আলোচনার এক নির্ম্মল বাতাস তাঁহাদের জীবন-তরীর পালে আসিয়া লাগিতেছিল—সেই বায়ুভরে তাঁহারা ধীরে ধীরে তাঁহাদের কাম্য সমুদ্রের দিকে চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাক্যে এবং কার্য্যে বৈরাগ্যের ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। কেদারনাথের জীবন-তরীখানি যেন প্রবলতর বেগে ছুটিতেছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি চারুচন্দ্র তাঁহার এইরূপ বৈরাগ্যের ভাব লক্ষ্য করিয়া মনে-প্রাণে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি কেদারনাথকে বলিলেন, "মহাশয়, আর কেন, এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন"। ব্যাকুল-হৃদয় কেদারনাথ চারুচন্দ্রের কথার মর্ম্ম বুঝিয়া বলিলেন—"কোথায় যাব"? চারুচন্দ্র বলিলেন,—"হরিদ্বারে নিরঞ্জনানন্দজী রহিয়াছেন, আপনি তাঁহার কাছে গিয়া কিছু দিন বাস করুন। আমি পত্র লিখিয়া দিতেছি।" কেদার-নাথ উহাতে সম্মত হইলেন কিন্তু মুস্কিল হইল তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ রামচন্দ্র মৌলিক মহাশয়কে লইয়া। বৃদ্ধ তাঁহার অন্ধের যষ্টিস্বরূপ পৌত্রকে কিছুতেই কাছ-ছাড়া করিবেন না;

আবার যদি তিনি শুনেন তাঁহার একমাত্র ভরসাস্থল পৌত্র সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে, তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে না। এই বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য চারুচন্দ্র এক কৌশল আবিষ্কার করিলেন, তাহা এই—কেদারনাথ কয়েকখানা পোষ্টকার্ড পিতামহের উদ্দেশে এই ভাবে লিখিলেন যে, "আমি কলিকাতায় বেশ ভাল আছি এবং চাকরির সন্ধান করিতেছি। আশা করি শীঘ্রই একটা ব্যবস্থা হইয়া যাইবে, ইত্যাদি।" এই পোষ্টকার্ডগুলি চারুচন্দ্র তাঁহার বন্ধু শচীন্দ্রনাথের নিকট কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। শচীন্দ্র উহার এক একখানা চারুচন্দ্রের নির্দ্দেশমত ডাকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। এদিকে কেদারনাথ পিতামহকে বলিলেন, "আমি কলিকাতায় চাকরির সন্ধানে যাইতেছি।" পিতামহের অনুমতি পাইয়া তিনি রওয়ানা হইলেন হরিদ্বারে। ইহা ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগের কথা।

ইহার কিছুকাল পরে কলিকাতা হইতে শচীন্দ্রনাথের পত্র লইয়া আর একটি উৎসাহী যুবক আসিয়া চারুচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। চারুচন্দ্র নিজের আবাসেই একটি কুঠরী তাঁহার বাসস্থানের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এই যুবক ছত্রে অন্ন ভিক্ষা করিতেন এবং চারুচন্দ্রের আবাসে অবস্থান করতঃ সাধন-ভজনে মনোনিবেশ করিলেন। এই যুবকের উৎসাহ এবং হৃদয়ের উদারতা ও ব্যাকুলতা যেন অপরিসীম বলিয়া মনে হইত। ইঁহাকেই আমরা

পথিপার্শ্ববর্ত্তিনী রোগিণী নৃত্যকালীর সেবায় প্রথম দেখিয়াছি।

কেদারনাথ প্রাণের অসীম বৈরাগ্য লইয়া হরিদ্বারে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বাটীতে চারুচন্দ্রের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মালোচনার সভা এখন হইতে হরিনাথের গৃহে আরম্ভ হইল। এই সময় হইতেই চারুচন্দ্রের নেতৃত্বে ইঁহাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র এবং পবিত্র সঙ্ঘ দৃঢ়রূপে গড়িয়া উঠিল। সকলে মিলিয়া ধ্যান-ধারণাদির সাহায্যে জগৎকারণ পরমেশ্বরের উপলব্ধি করাই এই সঙ্ঘের প্রত্যেকের জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। জগতের কোন্ ভাবের মধ্য দিয়া—কোন্ কর্ম্মের মধ্যে দিয়া তাঁহার উপলব্ধি এবং প্রত্যক্ষ কেমন করিয়া ঘটিবে, তাহারই অনুসন্ধানে ইঁহাদের হৃদয়-মধুকর দিবারাত্রি অস্থির হইয়া খুঁজিতে লাগিল।

চতুর্থ অধ্যায়।

ভাব এবং কর্ম্ম দুইই মানবের সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয়ের প্রধান কারণ। দিবা এবং রাত্রি দুইএরই মাঝে যেমন পূর্ব্বাপর ভাব অবিচ্ছেদ্য, তেমনি ভাবের পর কর্ম্ম আসে এবং কর্ম্মের পর ভাবও নূতন হইয়া দেখা দেয়, ইহাই প্রকৃতির বিধান। তাঁহারাও তাই ভাব এবং কর্ম্ম এই দুইএর পথেই আপনাদের আকুল চিত্ত লইয়া তাঁহাদের আরাধ্য দেবতাকে খুঁজিতেছিলেন। তাঁহারা এখন স্বামীজীর কর্ম্মযোগ নামক গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। অপূর্ব্ব পাঠক চারুচন্দ্র পঠিত বিষয় আলোচনা দ্বারা বন্ধুদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে অদ্বিতীয় ছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাহাতে রসে ডুবিয়া যাইত। প্রতিদিন চারুচন্দ্রের পাঠ এবং তাঁহার ব্যাখ্যায় হরিনাথের গৃহ যেন একটি নৈমিষারণ্যে পরিণত হইয়া উঠিল। অধ্যাত্মরাজ্যের যে বিষয় আগে তাঁহারা ধরিয়া উঠিতে কঠিন বোধ করিতেন, কর্ম্ম-যোগের ব্যাখ্যার মধ্যে সেগুলিকে তাঁহারা যেন নয়নের সম্মুখে এবং অন্তরের অন্তরে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন।

জীবনের স্রোত অদৃশ্য বাতাসের মত জগতের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেই স্রোত কর্ম্মের বনে বিবিধ ভাব-পুষ্পের রাশি হইয়া নিত্য প্রত্যক্ষরূপে ফুটিয়া উঠিতেছে।

তাহা কুড়াইয়া তুলিয়া বিশ্বনিয়ন্তার চরণে অঞ্জলি দিবার সুযোগ হয়ত প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের সম্মুখ দিয়া অলক্ষিতভাবে চলিয়া যাইতেছে।

আজ ১৯০০ খৃষ্টাব্দ—১২ই জুন! অপরাহ্নে উদ্বোধন পত্রখানি চারুচন্দ্র পাইলেন। উহার সূচীতেই দেখিলেন, স্বামী বিবেকানন্দজীর রচিত—"সখার প্রতি"—নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। উদ্বোধনের পাতাটি খুলিতেই চারুচন্দ্রের চোখে পড়িল—

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

কবিতাটির এই শেষ দুই ছত্র পড়িয়াই চারুচন্দ্রের ভাব-জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইল। চারুচন্দ্র উহা পুনঃপুনঃ পড়িতে লাগিলেন। তার পর আবার পড়িতে লাগিলেন ;—

"ব্রহ্ম হ'তে কীট পরমাণু, সর্ব্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন-প্রাণ-শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।"

পড়িতে পড়িতে চারুচন্দ্রের শরীরে কি যেন এক অপূর্ব্ব রোমাঞ্চ হইতেছিল। স্বামীজীর এই আকুল আহ্বান চারুচন্দ্রের অন্তরাত্মাকে উল্লসিত করিয়া তুলিল। চারুচন্দ্র আবার পড়িতে লাগিলেন :—

"মন্ত্র, তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম' এই মাত্র ধন।"

চারুচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ইহাই ধ্রুব সত্য এবং নিত্য। তিনি অন্তরে অন্তরে ভাবিতে লাগিলেন, যত কিছু করি সবই ত আমার আপনার জন্য। আপনার জীবনের মধ্যে সব জিনিষ আনিয়া পুঞ্জীভূত করিয়া জীবনকে কেবল ভারগ্রস্ত করা। কিন্তু, নারায়ণ জ্ঞানে যে জীবসেবা, সেই ত প্রকৃত সাধনা। সেই ত জীবনের সত্য ঐশ্বর্য্য। এই সাধনাই ত ঈশ্বর লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। এতদিনে যেন তিনি বাত্যাবিক্ষুব্ধ জীবন-সাগরে ভাসিতে ভাসিতে দূরে একটি রেখা দেখিতে পাইলেন।

নবভাবে অনুপ্রাণিত চারুচন্দ্র আর একা অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। তিনি তখনই যামিনীরঞ্জনের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, যামিনী গৃহের নিভৃত কোণে করে জপমালা লইয়া নামজপে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। চারুচন্দ্র কষ্টে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। যামিনীরঞ্জন তখন সাড়া দিলেন না। চারুচন্দ্র তখন অধৈর্য্য হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি তুমি মালা ঠক্ ঠক্ কচ্ছ। এই শুন স্বামীজীর কথা।" যামিনীরঞ্জন অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া আসিলেন। চারুচন্দ্র তখন তাঁহাকে বলিলেন, "অচেতন কাঠের মালার জপ হইতে শ্রেষ্ঠ জপ আমাদের

সম্মুখেই রহিয়াছে। এই শুন স্বামীজীর বেদান্ত বাণী। এই যে সম্মুখে ব্যাধিপীড়িত বুভুক্ষু দরিদ্রদিগকে দেখিতেছ, উহারাই আমাদের ঈশ্বর—আমাদের নারায়ণ—আমাদের শিব।”

পঠিত উদ্বোধন তখনও চারুচন্দ্রের কর-সংলগ্নই রহিয়াছে। উভয় বন্ধুরই মনে হইতে লাগিল বারাণসীর পথে পথে জীর্ণ কুটীরে কুটীরে ছিন্ন বস্ত্রাবৃত কোন শীর্ণ শরীরে পরমাত্মা আপনাকে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া স্তব্ধ ভাবে যেন তাঁহাদেরই সেবার প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহারই অনুসন্ধানের ভাবে তাঁহারা তখন ডুবিয়া গেলেন। আর তখন তাঁহারা যে কি ভাবিয়াছিলেন, একমাত্র বিশ্বনাথই তাহা জানেন। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিয়া গেল, পরে উভয়ের মধ্যে স্বামীজীর ঐ কবিতাটি অবলম্বন করিয়া অনেক আলোচনা হইল এবং স্বামীজীর বহু আদর্শ গুণ, সেবা ও সাধনার কথা উভয়ের মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল। চারুচন্দ্র তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ চিন্তাশীলতার ভিতর দিয়া যামিনী-রঞ্জনকে সুন্দরভাবে বুঝাইতে লাগিলেন যে, “শুন যামিনী, স্বামীজী বলিয়াছেন, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম এই জগতের প্রত্যেক জীবের ভিতরেই রহিয়াছেন। এই ব্রহ্ম-ভাবকে জাগাইয়া তোলাই সকল ধর্ম্মের, সকল সাধনার এবং সকল কর্ম্মের মূল। আজ স্বামীজী ইহাই আমাদিগকে বুঝাইলেন—এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি

সাধন এবং জীবনকে সর্ব্বতোভাবে শক্তিসম্পন্ন করাই সার মনুষ্য-ধর্ম্ম। চারুচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া উৎসাহী যামিনীরঞ্জনের শিরায় শিরায় যেন স্বামীজীর ভাবরাশি প্রবাহিত হইয়া চলিতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে তখন ভাবের ব্যবধান অতি অল্পই ছিল। তখন রাত্রির প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; আর উভয়ের মধ্যে কোন বাক্যালাপ হইল না। আর কিছু না বলিয়াই চারুচন্দ্র আপন ঘরে চলিয়া গেলেন, আর ভাবের আবেগে পূর্ণ হইয়া যামিনীরঞ্জনও ধীরে ধীরে আপন শয্যায় শয়ন করিলেন। অননুভূতপূর্ব্ব—আনন্দময়—স্বর্গ-সাম্রাজ্যের বিজয়বৈজয়ন্তী কখন্ তাঁহাদের মানস-মন্দিরে উড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা তাঁহারা উভয়েই তখন জানিতে পারিলেন না। সেই রজনী যামিনীরঞ্জন জাগরণে বা নিদ্রায় অথবা অর্দ্ধ-জাগরণে বা অর্দ্ধ-নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীবিশ্বনাথই জানেন। এই ভাবময়ী রজনীর মঙ্গলময় প্রভাতেই কিন্তু, আমরা যামিনীরঞ্জনকে সেই মুমূর্ষু বৃদ্ধার শিয়রে বসিয়া সেবা-ব্রতে দীক্ষিত দেখিয়াছি।

পঞ্চম অধ্যায়।

পরদিবস ১৩ই জুন প্রভাতকাল কিভাবে যামিনীরঞ্জনের কাছে আসিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। যামিনীরঞ্জনের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া বৃদ্ধা নৃত্যকালী তখন অল্প অল্প কথা বলিতে পারিতেছেন। কথা বলিতে বৃদ্ধার খুবই কষ্ট হইতেছিল—কিন্তু যাঁহাকে নিমিত্ত করিয়া বিশ্বনাথ তাঁহার জীবনকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, সেই সন্তান-তুল্য শিয়রে উপবিষ্ট যুবকের কাছে প্রাণের দুঃখের কথাগুলি বলিবার জন্য বৃদ্ধার হৃদয়ের স্নেহ, আবেগ ও বেদনা এবং আনন্দের অশ্রু সমস্তই যেন একসঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল এবং তাঁহার সেইসকল করুণ-কাহিনী শুনিয়া, যামিনীরঞ্জনের আবেগ-অশ্রু ধারণ তাঁহার কোমল হৃদয়ে কিরূপ আঘাত ও সমবেদনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

সেই সকল কথা যামিনীরঞ্জন তাঁহার বন্ধুগণের নিকট যখন জানাইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইয়া দুঃখে, করুণায় এবং সহানুভূতিতে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা এতদিন মাত্র শুনিয়াছিলেন, কত ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী শেষ জীবনে এই পুণ্যক্ষেত্রে বাস করিবার জন্য আসিয়া অনেক সময়েই এই প্রকার বিপন্ন

হইয়া পড়েন এবং কোন গৃহস্বামীর গৃহের অংশ বা গৃহ বিশেষ ভাড়া লইয়া কাশী-বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐ আগন্তুক যাত্রিগণ তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ বা মূল্যবান্ তৈজসপত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি—তাঁহাদের শেষ জীবনের সম্বল—সমস্তই গৃহস্বামীর নিকট রাখিতে বাধ্য হয়। এমন কি, অন্তিমকালের ঘাট-খরচ বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচের টাকা গৃহস্বামীর নিকট জমা না রাখিলে প্রায় কোন গৃহস্থই তাঁহাদের গৃহে স্থান দিতে সম্মত হন না। হায়! ঐ সকল অসহায়দিগের অন্তিমকাল উপস্থিত হইলে কোন কোন নির্দ্দয় গৃহস্বামী নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিষ্ঠুরতার চরম সীমায় পৌঁছিয়া, সেই মুমূর্ষু আশ্রিত বা আশ্রিতাগণকে কোন নির্জ্জন পথিপার্শ্বে অথবা অন্যের অজ্ঞাতসারে জনসমাগম-শূন্য গঙ্গাতীরে ফেলিয়া আসিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না, এই সকল কথা তাঁহারা পূর্ব্বে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময় এবং দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ নিষ্ঠুর গৃহস্বামীদিগের এইরূপ ব্যবহারের কারণ এই যে, আশ্রিতা-দিগের মৃত্যু হইলে আত্মীয়-স্বজন কেহ যদি আসিয়া তাঁহাদের গচ্ছিত অর্থ বা তৈজস-পত্রাদির দাবী করেন, অথবা ঐরূপ লোকের মৃত্যু গৃহস্বামীর গৃহে হইলে, তাহা জানিতে পারিয়া পুলিস্ আসিয়া বেওয়ারিস্ কাশী-বাসিনীর অর্থের দাবী করিয়া গৃহস্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করে, সেই জন্যই মৃত্যুর

অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহাদিগকে গঙ্গাতীরে বা কোন নির্জ্জন পথে ফেলিয়া আসিতে পারিলেই তাহারা নিশ্চিন্ত হইত। কারণ, সেইখানে তাহাদের মৃত্যু হইলে, মৃত ব্যক্তি যে কোথায় ছিল বা তাহার ধনসম্পত্তি কোথায় আছে, কেহই তাহার সন্ধান পাইবে না এবং মৃতের যাহা কিছু সম্পত্তি, সমস্তই গৃহস্বামী নির্ব্বিবাদে আত্মসাৎ করিতে পারিবে। তাঁহারা আরও শুনিয়াছেন যে, চৌকাঘাট হাঁসপাতাল নামে বরুণা ও অসির বাহিরে এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে ঐ প্রকার মুমূর্ষু ব্যক্তিগণকে গৃহস্বামীরা কিছু অর্থ দিয়া রাখিয়া আসেন এবং হয়ত হাঁসপাতালে তাঁহাকে রাখিয়া নিজের একটি ভুল ঠিকানাও দিয়া আসিয়া থাকেন। হাঁসপাতালে রোগিণীর মৃত্যু হইলে গৃহস্বামী তাহার সঞ্চিত অর্থ এবং যাহা কিছু তৈজসাদি সামগ্রী থাকে, তাহা নিষ্কণ্টকে আত্মসাৎ করেন। এতদিন তাঁহারা ঐ সকল কথা কিম্বদন্তীর মত শুনিয়াই আসিয়াছেন। আজ তাঁহারা দেখিলেন যে, এ সমস্তই তো সত্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কয়েক সপ্তাহ পর রোগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া বৃদ্ধা সুস্থ শরীরে হাঁসপাতাল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। সেবাব্রতে দীক্ষিত যুবকগণ এই একটি কাজের সফলতায় যেন প্রাণের ভিতরে অসীম বল লাভ করিয়াছেন। আজ তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। আজ সমস্ত বারাণসীক্ষেত্র যেন তাঁহাদের অন্তরের দৃষ্টিতে একটি বিরাট কর্ম্মশালা হইয়া পড়িল। তাঁহারা তখন নবীন উৎসাহে নগরের গলিতে গলিতে, গঙ্গাতীরে, ধর্ম্মশালাগুলিতে অথবা পথিপার্শ্বে যেখানে যেখানে পারিতেন, সকল স্থানেই নিত্য ভ্রমণ ও অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে লাগিলেন। দুই একদিনের মধ্যে তাঁহারা বহু দুঃস্থ নরনারীর সন্ধান পাইলেন। পরম উৎসাহে মনঃপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া তাঁহারা সেই সব দুঃস্থ নরনারায়ণের সেবায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহারা সঙ্কল্পে দৃঢ়, উপায় নির্দ্ধারণে ভগবানে সমর্পিত-প্রাণ, শ্রমে লৌহ-কঠিন ও অকাতর এবং সাধনায় সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জক ছিলেন। চারুচন্দ্র ঐ যুবকমণ্ডলীর সেবাব্রতকে প্রতিমুহূর্ত্তে নব নব ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া চারিদিক হইতে সমস্ত আয়োজন, নিরবধি প্রেরণা এবং কর্ম্মের উৎসাহ দিয়া তাঁহাদিগকে একত্র রাখিতে প্রাণ-মনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আর

যামিনীরঞ্জন তাঁহার অসীম কার্য্যকরী শক্তিদ্বারা তাঁহাদের মধ্যে কর্ম্মীর জ্বলন্ত নিদর্শন হইয়া উঠিলেন। চারুচন্দ্রের ভাব আর প্রাণ, যামিনীরঞ্জনের হৃদয় আর কর্ম্ম—এক হইয়া বারাণসীর অসহায় দুঃস্থদিগের তাপিত অন্তরের মধ্যে যেন আর একটি আশা ও সান্ত্বনা-গঙ্গার সৃষ্টি করিয়া চলিল।

তাঁহারা দেখিলেন, ৺শিবধাম এই বারাণসী নগরী বহু যুগ-যুগান্তর হইতে হিন্দু-সভ্যতার মহাকেন্দ্রস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ভারতের এমন স্থান নাই, যাহার আধ্যাত্মিক যোগ এই মহাযোগ-ক্ষেত্রের সহিত নাই। নিখিল ভারতের সকল প্রদেশেরই নরনারী এই পুণ্যতীর্থে আসিয়া যুগে যুগে ধন্য হইতেছেন। বিদ্যার্থী বিদ্যার্জ্জন মানসে, ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মলাভাকাঙ্ক্ষায়, অর্থার্থী শিল্প-বাণিজ্যময় এই বিপুল নগরীতে ধনার্জ্জন কামনায় এবং সংসার-বিরক্ত গৃহস্থ বিশ্বনাথ-পুরীর মধ্যে তনুত্যাগে পরব্রহ্মে লীন হইবার আশায়,—বাস করিবার জন্য বহু প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মুক্তিক্ষেত্রে প্রতিদিনই আসিতেছেন। জগতে এমন প্রাচীন তীর্থ—এমন সর্ব্বজনসেব্য ও এমন সর্ব্বজনকাম্য স্থান আর কোথায়? মাতা অন্নপূর্ণা পুরীর মধ্যে কাহাকেও অভুক্ত রাখেন না, এই জনশ্রুতি চিরযুগ ধরিয়া এখানে সফল হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বাষ্পীয়যান ভারতের দূরতম স্থানকেও একান্ত সুগম করিয়া তোলায়—জনসমাগম এখানে পূর্ব্বাপেক্ষা দিন দিন ক্রমেই অধিকতর হইয়া

উঠিতেছে। প্রাচীন যুগের যে সব সুবিধা ছিল, তাহার অনেকই দ্রুতভাবে হ্রাস পাইতেছে এবং এ যুগের অনেক নূতন অভাব-অভিযোগের ও প্রতিকারের তেমন সুব্যবস্থা হইয়া উঠিতেছে না, ইহা সত্য। তথাপি এখানে দরিদ্র বিদ্যার্থীর সংখ্যা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়া চলিতেছে। প্রাচীনকালে অধ্যাপকের গৃহে বা পরিচিত কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাটীতে বা সত্রে, তাঁহারা আশ্রয় পাইতেন এবং অনেকেই তাঁহাদের পরিবারের মধ্যে পরিগণিত হইয়া যাওয়ায়, আধি-ব্যাধির সময়ও তাঁহারা নিজগৃহের মতই সেবা-শুশ্রূষা ও যত্ন পাইতেন। সে উপায় কিন্তু, এখন প্রায় নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণদিগকে অন্নসত্রগুলিতে একবেলা যে আহার দেওয়া হয়, তাহারই কতক অংশ এখন ইঁহাদিগের একমাত্র অবলম্বন। অপর বেলার আহার এবং আপন আপন বাসস্থানের ব্যবস্থা এখন তাহাদিগকে বহুপ্রকার প্রয়াসে করিয়া লইতে হয়। তাহার উপর এই অপরিচিত স্থানে—দূর বিদেশে হঠাৎ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলে ঐ সকল দরিদ্র বিদ্যার্থীর শুশ্রূষার ও ঔষধ-পত্রের ব্যবস্থা হইবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। এরূপ অবস্থায় তাহাদের কষ্টের যে সীমা থাকে না, তাহা অনুভব করা একটুও শক্ত নহে। আবার ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত দরিদ্র শ্রমিক,—ধনী ব্যক্তিগণের গৃহে কর্ম্ম করিয়া, উদরান্ন সংস্থানের আশায় কোনক্রমে পাথেয় মাত্র সংগ্রহ করিয়া, এখানে আসিয়া

উপস্থিত হয়। যখন তাহাদের সেই সামান্য অর্থ কাজকর্ম্মে যোগদানের চেষ্টা করিতে করিতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়, তখন ভাগীরথী-তীরের পাষাণ-সোপান এবং প্রকাশ্য রাজপথের ধূলিমণ্ডিত ক্রোড় ব্যতীত তাহাদের আর অন্য আশ্রয় থাকে না। তাহার পর ব্রাহ্মণেতর জাতির কোন ব্যক্তিকে অন্নসত্র হইতে নিত্য ভোজন করাইবার নিয়ম না থাকায়, গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ও অলাভে উপবাস ছাড়া আর তাহাদের গত্যন্তর থাকে না। দিক্ দিক্ হইতে এই অনাথনাথের মহাপুরীতে মুষ্টিমেয় ভিক্ষা পাইবে এই আশা করিয়া নিত্যই যে কতলোক আসিতেছে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। উহাদের মধ্যে কেহ পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলে, তাহাকে দেখিবার বা তাহার সেবাশুশ্রূষা করিবার কেহই নাই। অতি যৎসামান্য অর্থ সম্বল করিয়া—কেহ বা কোন আত্মীয়ের নিকট সাহায্য পাইবার প্রতিশ্রুতি পাইয়া—অনেক বয়ঃস্থা হিন্দু-বিধবা এই পুণ্যক্ষেত্রে বাস করিতে আসেন, তাঁহাদের সঞ্চিত অল্প অর্থ শীঘ্র নিঃশেষিত হইয়া গেলে বা দূরস্থ আত্মীয়ের সাহায্য কোন কারণে বন্ধ হইলে, এই বিপুল জনসমাকীর্ণ নগরীতেও তাঁহারা একান্ত অসহায় হইয়া পড়েন। অর্থাভাবে নিজ বাসগৃহের নিয়মিত ভাড়াপ্রদানে অসমর্থ হওয়ায়, তখন গৃহস্বামী তাঁহাদিগকে বাটী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। তখন তাঁহাদের দুর্গতিরও সীমা থাকে না। একে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে নিদারুণ ক্লেশ, তাহার উপর গৃহশূন্য হইয়া তাঁহারা

যে কিরূপ নিরুপায় অবস্থায় পড়েন, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। আর যাঁহারা ৺বিশ্বনাথ দর্শনে আসিয়া দুর্ভাগ্য-ক্রমে সহসা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন, তখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধববিহীন এই সুদূর বিদেশে তাঁহাদের কষ্টের অবধি যে কোথায়, তাহা ভাবিলে অশ্রু বাধা মানে না। নিত্য এইরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে করিতে চারুচন্দ্র প্রভৃতি অন্তরে অন্তরে দারুণ ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং আচার্য্য বিবেকানন্দজীর নবভাববৈশিষ্ট্যে গঠিত-চরিত্র যুবকদের হৃদয়ে আর্ত্তের প্রতি সে সমবেদনা এবং অশ্রুরাশি মিলিত হইয়া তখন যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। নিরন্নের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে হইবে, ব্যাধিগ্রস্তের সেবাশুশ্রূষা করিতে হইবে এবং তাহাদের ঔষধ-পথ্যাদির সুব্যবস্থা করিতে হইবে, দরিদ্র বিদ্যার্থীদের সাহায্য করিতে হইবে, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং দুঃখী-দরিদ্রের অভাব-অভিযোগের—যে কোন প্রকারেই হউক লাঘব করিতে হইবে, এই সকল কার্য্যের জন্য "বারাণসী-দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার-সমিতি" নামে একটি সেবক-সঙ্ঘ অচিরেই তাঁহাদের প্রযত্নে প্রতিষ্ঠিত হইল। চারুচন্দ্রের প্রাণ, যামিনীরঞ্জনের মন এবং অন্যান্য যুবকগণের হৃদয় ও দেহ একত্র মিলিত হইয়া এই মহনীয় কার্য্যের এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া দিল। তখন তাঁহাদিগের সংখ্যা ছিল, মোট আটজন মাত্র।

এই সমিতির কার্য্য কেদারনাথের গৃহেই প্রথমে চলিতে লাগিল এবং তখন হইতেই চারুচন্দ্র, কেদারনাথ ও যামিনীরঞ্জন এই তিন জনে তাঁহাদের পারিবারিক সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, কায়মনোবাক্যে সমিতির কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। বারাণসীধামের গৃহে গৃহে অনুসন্ধান করিয়া—বাড়ী বাড়ী গিয়া, তাঁহারা যেখানে পাইতেন পূর্ব্বোক্ত-রূপ অসহায় ও সহায়হীনাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সেবা করিতে লাগিলেন। যে সব অসহায় বা সহায়হীনাকে রাস্তায় বা গঙ্গাতীরে পতিত অবস্থায় পাইতেন, তাহাদিগকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিয়া, তাহাদের সুচিকিৎসা প্রভৃতির সমস্ত ব্যবস্থাই করিতে লাগিলেন। এই সব কাজের ব্যয়-আদি নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারা গৃহে গৃহে ভিক্ষা দ্বারা চাউল, পুরাতন বস্ত্র ও পয়সাকড়ি প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে প্রায় তিন মাস কাল অতিবাহিত হইল।

তাঁহাদের কার্য্যভার ধীরে ধীরে ক্রমেই গুরু হইতে গুরুতর হইতে লাগিল এবং কার্য্যক্ষেত্রও বিস্তৃততর হইতে লাগিল। তাঁহাদের অকপট প্রাণঢালা কার্য্য, তাঁহাদের অক্লান্ত শ্রম এবং তাঁহাদের হৃদয়ভরা ব্যাকুলতা—বারাণসীর অনেক গৃহেই ক্রমে সুপরিচিত হইয়া উঠিল এবং স্থানীয় কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তির শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিও এই সেবাব্রতধারী যুবকগণের কার্য্যকলাপে আকৃষ্ট হইল। কাশীধামের বিখ্যাত বাঙ্গালী জমিদার সুপণ্ডিত রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুর

এবং উদার-হৃদয় বাবু সোমনাথ ভাতুড়ী মহাশয় ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ভাবে উল্লেখযোগ্য। সেবাব্রতীদের কার্য্য ইঁহাদের হৃদয় এম্‌নি আকর্ষণ করিল যে, এই স্বনামধন্য ব্যক্তিদ্বয়ের উদ্যোগে ১৯০০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাঙ্গালীটোলা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গৃহে ঐ সমিতির প্রথম সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। এই সভায় বহু মহাপ্রাণ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সর্ব্বসম্মতিক্রমে "কাশীধাম-দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার-সমিতি" সমিতির এই নামটি অনুমোদিত হইল এবং বহু ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া সমিতির কার্য্য পরিচালন ব্যবস্থার জন্য একটি কমিটীও সংগঠিত হইল এবং সমিতির প্রথম নিয়মাবলীও ঐ সভাতে লিপিবদ্ধ হইল।

চারুচন্দ্রের কল্পনা এবং যামিনীরঞ্জনের উদ্যমের বীজ হইতে সেদিন যে বৃক্ষটি জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, আজ তাহা শাখা-পল্লব-সমন্বিত হইয়া উঠিল। আজ তাঁহাদের আনন্দের দিন, কি আরও গুরুতর কর্ত্তব্যের দিন, এ দুই ভাবের আলোড়নে তাঁহাদের দুই জনের এবং তাঁহাদের বন্ধুবর্গের হৃদয় আন্দোলিত হইতে লাগিল। একদিকে উল্লাস, আর একদিকে উদ্যম—দুইএর সহিত মিলিয়া আজ বারাণসীর পূত ভাবরাজ্য যেন তাঁহাদিগকে বুকের মধ্যে করিয়া আলিঙ্গন করিতেছে। তাঁহারা আপনাদিগের কাজ নীরবে—সানন্দে—দৃঢ়তরভাবে ও পরিপূর্ণ উৎসাহের সহিত করিয়া যাইতে লাগিলেন।

কলিকাতাতে শচীন্দ্রনাথ বসু ছিলেন চারুচন্দ্রের বন্ধু। চারুচন্দ্রের পত্রে সমিতির এ প্রকার কার্য্য-কলাপের কথা এবং তাহাতে তাঁহার সেইভাবে আত্মনিয়োগের কথা জানিতে পারিয়া শচীন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকজন বিশিষ্ট সুহৃদের সহিত মিলিত হইয়া কাশীধামের উক্ত সমিতির একটি শাখা কলিকাতাতেও স্থাপন করিলেন। পূর্ণ উৎসাহে দুই দিকেই কাজ চলিতে লাগিল। ইহা ১৯০০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর বা নভেম্বর মাসের কথা।

আজ সঙ্ঘের কর্ম্মিগণের হৃদয় সাধুসঙ্কল্পে আরও দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা অশক্ত, যাহারা পরিত্যক্ত, যাহারা রুগ্ন, যাহারা দরিদ্র, তাহারাই যেন কর্ম্মিগণের পরম আপন। আজ তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে সাধারণের সমক্ষে একথা যে বলিতে পারিতেছেন, ইহা ভাবিয়াও তাঁহারা পুলকিত হইতেছেন। আজ যেন তাঁহাদের কর্ত্তব্যের গণ্ডী বাড়িয়া চলিতেছে। তাঁহারা নিরন্নদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিবেন। অর্থাভাবে যে সকল রোগী অসময়ে ধরা হইতে চলিয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে প্রাণপণে ফিরাইবার চেষ্টা করিবেন। যেখানে চিকিৎসার উপায় নাই, সেখানে তাঁহারা উপস্থিত হইয়া তাহার উপায় বাহির করিবেন। যেখানে আর সকল থাকিতেও শুশ্রূষাকারীর অভাবে রোগী শমন-কবলে পতিত হইতেছে, সেখানে গিয়া তাঁহারা বুক পাতিয়া উন্মুক্ত-প্রায় শমনের দ্বার রুদ্ধ করিবেন। যাহারা পথের ধূলিতে

রোগগ্রস্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া আছে, সেই গৃহহীন অনাথ রোগীদের জন্য, যেমন করিয়া হউক গৃহের ব্যবস্থা তাঁহারা করিয়া দিবেন। হাঁসপাতালে হাঁসপাতালে তাঁহাদের সেবাব্রত উদ্‌যাপিত হইবে; জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের সেবার অধিকার, তাঁহারা জীবন দিয়া পালন করিবেন। যে সকল ভদ্রবংশীয় নিঃস্ব নরনারী প্রাণত্যাগেও প্রস্তুত, কিন্তু, সাধারণ দানস্থলে উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত, তাঁহাদিগের মান এবং তাঁহাদিগের প্রাণ তাঁহারা সাধ্যমত রক্ষার চেষ্টা করিবেন। অন্ধ, অথর্ব্ব ও বৃদ্ধ বলিয়া যাঁহারা ভিক্ষা করিতেও অসমর্থ, কর্ম্মিগণ তাঁহাদের বাসস্থানে গিয়া, তাঁহাদিগের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিবেন এবং কাহার কি যথার্থ আবশ্যক, নিয়ত তৎসম্বন্ধে সতর্ক থাকিয়া প্রাণপণ যত্নে তাহা পরিপূরণের প্রয়াস পাইবেন। কর্ম্মিগণের এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প কূলপ্লাবিনী নদীর মত তাঁহাদের হৃদয়ের কানায় কানায় উপ্‌ছিয়া উঠিয়াছিল। সেই নদীতে বর্ষাগমের দিনে কর্ম্মের জোয়ার এবং আনন্দের জোয়ার মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে যেন ভাসাইয়া দিল।

এইরূপে কর্ম্মিগণ যখন আপনাদের হৃদয়ের ঐ অব্যক্ত সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তখনও সমিতির কোন পৃথক্ আবাসগৃহ ছিল না। কেদারনাথের গৃহেই সকলে একত্র হইয়া যে পরামর্শ এবং কাজের অনুষ্ঠান করিতেন, মনঃপ্রাণে সমস্ত দিবস-রজনী তাহারই উদ্‌যাপনে তাঁহারা যত্ন করিতেন।

ক্রমে সমিতির কর্ম্মক্ষেত্র বিশেষরূপে বাড়িয়া যাইতে লাগিল এবং কর্ম্মিগণও তখন নিজেদের একটি স্বতন্ত্র কর্ম্মগৃহের বিশেষ প্রয়োজন বোধ করিতে লাগিলেন।

এদিকে আর্ত্ত এবং রোগীর সংখ্যাও দিনে দিনে বাড়িয়া চলিতে লাগিল। তাহা ছাড়া দাতব্য চিকিৎসালয়ে যাইতে অসম্মত এমন রোগীও মধ্যে মধ্যে পাওয়া যাইতে লাগিল। তাহার উপর দীর্ঘকালের রোগভোগান্তে অবধারিত মৃত্যু জানিয়া কোন হাঁসপাতালেই যাহাদিগকে গ্রহণ করিতে চায় না, এমন রোগীও তাঁহারা পাইতে লাগিলেন। এই প্রকার সঙ্কট সময়ে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া কর্ম্মিগণ ২৭৭ নম্বর দশাশ্বমেধ ঘাট রোডে তিনখানি ঘরভাড়া লইলেন এবং কেদারনাথের গৃহ হইতে সমিতির কার্য্যালয় এই স্থানে লইয়া গেলেন। তথায় একটি গৃহে ক্ষুদ্র একটি দাতব্য ঔষধালয় (Out door Dispensary) স্থাপন করা হইল। তথা হইতে—সমাগত পীড়িতদিগকে ঔষধ বিতরণ করা হইত। একটি গৃহে অসহায় আশ্রয়হীন রোগীদিগকে রাখা হইত। অপর একটি গৃহে ভাণ্ডার, রন্ধনশালা প্রভৃতি ছিল। চারুচন্দ্র এবং যামিনীরঞ্জন সমিতি-গৃহেই বাস করিয়া সেবা-কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হইলেন। সেই সময় হইতেই কেদারনাথ আপন গৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং তিনি ক্ষেমেশ্বর ঘাটে মাসিক তিন টাকা ভাড়ায় একটি ক্ষুদ্রবাটী ভাড়া লইয়া তথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের—যে চিত্রপট চারুচন্দ্র কর্ত্তৃক

কেদারনাথের গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা লইয়া গিয়া স্থাপন করিলেন। কেদারনাথই ঠাকুর-সেবায় নিযুক্ত হইলেন। সকালে ও সন্ধ্যায় তিনি ঠাকুর-সেবা ও নিয়মিত ধ্যান জপ আদি করিতেন এবং ঐখানেই রাত্রিবাস করিতেন। দিবাভাগে সমিতি-গৃহে আসিয়া, তিনি দরিদ্র নারায়ণগণের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্ষেমেশ্বর ঘাটে ঠাকুর-সেবার উপকরণ ছিল—ফুল, বিল্বদল ও গঙ্গাজল এবং নৈবেদ্য দেওয়া হইত এক পয়সার খৈ-বাতাসা। এই ঠাকুরকেই পরবর্ত্তিকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। ক্ষেমেশ্বর ঘাটের ঐ বাটীতেই কাশীধামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। সমিতির কার্য্যে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন চারুচন্দ্র, যামিনী-রঞ্জন এবং কেদারনাথ। তাঁহাদের অপরাপর পাঁচজন সঙ্গী কর্ম্মী আপন আপন আবাস-গৃহে থাকিয়াই নিজ নিজ দৈনন্দিন কর্ম্ম এবং বিদ্যা-অভ্যাসাদি সমাপনান্তে, অবসরমত আসিয়া সমিতির কার্য্য করিতেন। চারুচন্দ্রই ছিলেন যেন সমিতির মেরুদণ্ড, আর কেদারনাথ ও যামিনীরঞ্জন যেন তাহার সবল সুদৃঢ় বাহুদ্বয়। অন্যান্য কর্ম্মিগণ তাঁহাদেরই সহায়তা করিতেন।

তখন বারাণসীতে ৩৬৫টি ছোট বড় অন্নসত্র ছিল। ভিঙ্গারাজের একটি বৃহৎ অনাথালয় এবং কয়েকটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও ছিল, কিন্তু বারাণসীর সমস্ত দুঃস্থ এবং রোগীর

জন্য উহাই প্রচুর ছিল না। কেবলমাত্র ব্রাহ্মণগণ একবেলা অন্নসত্র হইতে আহার্য্য পাইতেন। আর পাইতেন সন্ন্যাসীরা। কিন্তু, উঁহাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে, তাঁহাদের সেই শারীরিক অক্ষমতা নিবন্ধন তাঁহারা সত্রে পঁহুছিতে পারিতেন না এবং সে ক্ষেত্রে আহার্য্য পাওয়ার সুবিধাও তাঁহাদের হইত না। কাজেই, অন্নসত্রগুলি সত্ত্বেও তাঁহারা উহার উপকার হইতে বঞ্চিত থাকিতেন। অনাথাশ্রমে স্থান অতিশয় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোকের জন্যই ছিল। তাহা পূরণ হইয়া গেলে, অপর অনাথদের ভরণ-পোষণের জন্য আর পৃথক্ ব্যবস্থার কিছুই ছিল না। তাহা ছাড়া যে সমস্ত অনাথ ও অক্ষম ব্যাধি বা বার্দ্ধক্য বশতঃ অনাথাশ্রমের দ্বারে উপস্থিত হইতে পারিত না, তাহাদিগের আশ্রয় দিবার বা সাহায্য করিবার কেহই ছিল না। তাহাদের দুঃখ অনুসন্ধান করিয়া কেহ তাহাদের কোন উপায় করে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

দেখিতে দেখিতে সমিতির গৃহখানি অসহায় রুগ্নগণে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং বাহিরে পীড়িতের যন্ত্রণাধ্বনি, দুঃস্থের ক্রন্দনের ক্ষীণ স্বর, অক্ষমদের দারুণ দুশ্চিন্তা, দরিদ্র মানীদের আহত মান, এবং জীবনে আশাহীনদের কাতর ক্রন্দন—সকলেই যেন এই গৃহদ্বারে আসিয়া কর্ম্মীদের কর্ম্মের উপরে মহাপ্রাণতার একটি গুরু আশীর্ব্বাদ সঞ্চারিত করিল। এইরূপে প্রায় পাঁচমাস কাল অতিবাহিত হইল। কিন্তু,

কার্য্য এতই বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, ঐ বাটীতে আর কিছুতেই স্থান সঙ্কুলান সম্ভবপর হইল না। সুতরাং কর্ম্মিগণ ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ডি ৮২।৩২ নং জঙ্গমবাড়ী মহল্লায় একটি বাড়ী মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকায় ভাড়া লইলেন এবং তথায় সমিতিকে স্থানান্তরিত করা হইল।

সমিতির এই ভাবেই কাজ চলিতে লাগিল—ক্রমে আরও দুই একজন উৎসাহী যুবক আসিয়া সমিতির কার্য্যে যোগদান করিলেন। নগরীর পথে গলিতে গলিতে, ৺গঙ্গার ঘাটে, বৃক্ষতলে, আনন্দকুটীরে এবং মুক্ত ধর্ম্মশালায়—কোন্‌খানে নয়? তাঁহাদের সেবা-ব্যাকুল হৃদয়খানি ঐ সকল স্থানের পুণ্য ধূলি-স্পর্শে বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রভাবে যেন বারাণসীতে এক নূতন সজীব সেবা-জগতের প্রাণসঞ্চার করিয়া তুলিল। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর উজ্জ্বল আদর্শে অনুপ্রাণিত যুবকগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং উৎসাহিত হইয়া তাঁহারই দেওয়া দান—"জীব ও ব্রহ্মের অভেদ" সিদ্ধান্তের সার মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার সঙ্কল্পেই তাঁহাদের মনঃপ্রাণ সেবাকার্য্যে সমর্পণ করিলেন। কাজের পর কাজ বাড়িয়া চলিল। এতদিন উৎসাহ ও আনন্দই তাঁহাদের কাজের সহায় হইয়া আসিতেছিল। আজ বিপদ্‌ও তাঁহাদের কাজের সহায় হইল। সংক্রামক রোগ যখন তাহার বিকট দশন বিকাশ করিয়া মুখ-বিবর হইতে অগ্নির শিখা বাহির করিতে লাগিল, কর্ম্মিগণ যে মুহূর্ত্তে ইহা দেখিলেন, তাহার পর

মুহূর্ত্তেই যেন তাঁহাদের কাজের সহায় পরম বন্ধু মনে করিয়া আহ্লাদে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। আপন আপন জীবন বিপন্ন করিয়াও কর্ম্মিগণ অহর্নিশ সেই সংক্রামক রোগাক্রান্ত আর্ত্তগণের সেবা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই আরও ধর্ম্মপ্রাণ উৎসাহী যুবকগণ আসিয়া এই সৎকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে লাগিলেন। হিন্দুর দেশে মৃত্যুঞ্জয়ের মহাপুরীতে মৃত্যু এবং অমৃতে এইরূপে কোলাকুলি চলিতে লাগিল। কিন্তু বোধ হয়, মৃত্যুঞ্জয়ের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁহার সেবকদের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া এই সঙ্কটের নদী পার করাইয়া দিবেন। তাই যুবক-গণের মধ্যে যে সব অক্লান্তকর্ম্মী সংক্রামক রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করিতেছিলেন, তাঁহাদের ভিতর হইতে দুই একজন "বহুজনহিতায় জগদ্ধিতায়" মন্ত্রে রুগ্নগণের জীবনে আপনার জীবনবলি উৎসর্গ করিয়া স্বয়ং শিবলোকে চলিয়া গেলেন। কঠিন বসন্তরোগে এইরূপ অগ্নি-পরীক্ষায় একজন কর্ম্মীর জীবন আহুতি প্রদত্ত হইল। কর্ম্মীরা কিন্তু, টলিলেন না। বিশ্বনাথের ত্রিশূল-মূলে তাঁহারা যে প্রাণ এবং যে মনকে কর্ম্মে দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বেশ্বরের ত্রিশূলের মত অটুট হইয়াই রহিল।

ক্রমে এইরূপে অনেক ঝঞ্ঝাবাত কর্ম্মিগণের উপর দিয়া বহিয়া গেল। তাঁহাদের কর্ম্মঠ শরীরে—নিত্য ব্যাকুল মনে ঝঞ্ঝার আঘাত আরও যেন তাঁহাদিগকে বল দিতে লাগিল।

এবং কর্ম্মক্ষেত্র ও কর্ম্মের প্রসার ক্রমেই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। আর জঙ্গমবাড়ীর ঐ ক্ষুদ্র বাটীখানিতেও দুঃস্থের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। সুতরাং সমিতির গৃহায়তন বড় করিবার প্রয়োজন হইল। কর্ম্মিগণ ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২রা জুন তারিখে ৩৮/১৫৩ নং রামাপুরা মহল্লায় অন্য একটি বাটীতে সমিতির কার্য্যালয় স্থানান্তরিত করিলেন। ঐ বাটীর ভাড়া ছিল মাসিক ১০৲ দশ টাকা।

চারিদিক হইতে দুঃস্থ ও রোগিগণের এবং বিপন্নজনের আর্ত্তধ্বনি যেমন প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহাদের উদার হৃদয়কে কখনও ব্যাকুল, কখনও বলবান্, কখনও নিরাশ এবং কখনও বা তেজীয়ান্ করিয়া তুলিত—তেমনই আর একদিকে বিশিষ্ট হৃদয়বান্ বন্ধুজন সর্ব্বদা তাঁহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান এবং আলোচনা করিয়া ও উপযুক্ত সময়ে নানাপ্রকারে সাহায্যদান করিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিতেন। একলক্ষ্য প্রাণের সম্মুখে ঘোর অন্ধকার মধ্যে উজ্জ্বল দীপ-মালার ন্যায় প্রতিদিনের সেবার দীপালি তাঁহাদের সকল নৈরাশ্য-অমাবস্যাকে এইরূপ আনন্দ-জ্যোৎস্না-খচিত করিয়া তুলিত এবং অমার পরে যে শুক্লা প্রতিপদ আবার আসিবে, এই কথা যেমন তাঁহারা নিজেরাও ভাবিতেন, তেমনি নিরাশ্রয় বিপন্ন ও রোগিগণের কর্ণমূলে আদর-সহানুভূতির সহিত করুণ অথচ আশাময় বাণীও শুনাইতেন। আহা! কে জানিত, কত যে নিরাশ-জীবন, কত যে রোগক্লিষ্ট

হতাশ-হৃদয় সে সুরের আশ্বাসঝঙ্কারে পলে পলে দিন গণিয়া আবার নবজীবনের কোলে ফিরিয়া আসিবে।

এইরূপে দেড় বৎসর অতীত হইল। ইহারই মধ্যে কর্ম্মিগণ ৩৩০ জন পুরুষ এবং ৩৪৪ জন মহিলাকে সমিতি হইতে সাহায্য প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই প্রায় ৭০০ ব্যক্তির সেবা, ঐ কয়েকজন কর্ম্মীর প্রাণঢালা সাধনায় সম্পাদিত হইয়াছিল। এই সেবা-গ্রহীতৃগণের মধ্যে ৬২৫ জন ছিলেন হিন্দু, ২১ জন ছিলেন মুসলমান। এই সেবাকার্য্যে সাধারণের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল মোট—২৪৫৬৸৶০ টাকা এবং খরচা হইয়াছিল, মোট—১৭৯৮৸৶১৫; আর উদ্বৃত্ত তহবিল ছিল টাকা ৬৫৭৸৶৫। তৎকালে কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুর ও মাননীয় মুন্সী মাধোলাল এবং সহকারী সভাপতি ছিলেন বাবু গোবিন্দদাস। আর সম্পাদক ছিলেন বাবু মোক্ষদাদাস মিত্র মহাশয়। কোষাধ্যক্ষ ছিলেন—রায় শম্ভুপ্রসাদ এবং আশ্রম-অধ্যক্ষ ছিলেন—চারুচন্দ্র ও যামিনীরঞ্জন। তদ্ভিন্ন সভার ২০ জন সভ্যও ছিলেন। ইহা প্রথম বর্ষের কথা। দ্বিতীয় বর্ষে এই সমিতির সভাপতি ছিলেন মাননীয় মুন্সী মাধোলাল। সহকারী সভাপতি মুন্সী দয়াশঙ্কর, বাবু গোবিন্দদাস এবং বাবু মোক্ষদাদাস মিত্র। সম্পাদক ছিলেন—বাবু কালিদাস মিত্র এবং সহকারী সম্পাদক বা সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন—চারুচন্দ্র ও যামিনীরঞ্জন।

সপ্তম অধ্যায় ।

সুখময়ী উষার কোলে সমন্বয়ের সমুজ্জ্বল পতাকা ভারত-আকাশে দেখা দিয়াছে। এই পুণ্যদেশে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই এক অপূর্ব্ব আন্দোলনের সাড়া পড়িয়াছে। তাহা জয়ের আন্দোলন এবং নবজীবনের নূতন জাগরণের আন্দোলন। ভুবনবিখ্যাত আচার্য্য পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দজী দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণের পর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় অভয় স্বরলহরী কুমারিকার তমালতালীবনরাজি-নীলা বেলাভূমি হইতে হিমাচলের দেবদারুবনমণ্ডিত তুষার-গৌর শৃঙ্গাবলী পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারত, সমগ্র দাক্ষিণাত্য ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া পুণ্যধাম কাশীক্ষেত্রে আসিয়াছেন। তাঁহার আগমনে মুক্তি-ক্ষেত্র বারাণসী যেন নূতন উদ্দীপনায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সকল মহল্লা হইতে তাঁহার দর্শন-কামনায় শুধু যে ভক্তজন তাহা নহে, পথের কাঙ্গাল হইতে ধনবান্ পর্য্যন্ত সকলেই জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছে এবং আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া স্বামীজীকে সর্ব্বদাই ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ভারতের গৌরব এবং ভারতের সর্ব্বস্ব

যেন একখানি আনন্দমূর্ত্তির মধ্যে আপনাকে প্রস্ফুটিত করিয়া রাখিয়াছে। কয়েক দিন ধরিয়াই চারুচন্দ্র এবং কর্ম্মিগণ সমিতির কর্ম্ম হইতে অবসরের সমস্ত ক্ষণ একের পরে একে, কখনও বা দুই তিন জন একত্রে তাঁহার সমীপস্থ রহিয়াছেন। চারুচন্দ্র প্রভৃতি দু'এক জন রাত্রিকালেও তাঁহার কাছে অবস্থিতি করিতেছেন। স্বামীজী তৎকালে শ্রদ্ধাভাজন কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের কাশীধামস্থ বাটীতে অতিথি ছিলেন। মোগলসরাই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া স্বামীজীকে চারুচন্দ্রপ্রভৃতি দুই তিন জন সেবক অভ্যর্থনা করিয়া আনা অবধি, তাঁহারা দু'একজন স্বামীজীর নিকটে সর্ব্বক্ষণ রহিয়াছেন। "দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার-সমিতি" যেন জীবন্ত হইয়া স্বামীজীর সহিত লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

প্রত্যহ নানাবিধ সৎপ্রসঙ্গ তাঁহার কাছে হইতেছিল। মানবের ধর্ম্ম কি? জীবনের সার্থকতা কোথায়? মানবজীবনের মূল্য কতটুকু, বা কত বৃহৎ? আর্য্য-জগৎ কি ভাবে এ সকল বিষয়ে আপন পরীক্ষা দিয়া গিয়াছে এবং এখনও দিতে পারে? পূর্ণ মনুষ্যত্বের উপলব্ধি কি প্রকারে, কোন্‌খানে হইতে পারে? এসকল বিষয়ের নিগূঢ় সিদ্ধান্ত সকল স্বামীজীর অমৃতমাখা বাণীতে প্রত্যহ ধ্বনিত হইতেছিল। সেই উদ্দীপনায় যুবকদের কর্ম্মোৎসাহ সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাঁহার প্রফুল্ল বদন-কমল হইতে সস্নেহ মধুর বাক্য সমূহ যুবকদের কর্ণে যেন অমৃতময় হইয়া বর্ষিতে লাগিল। সেই

'নারায়ণ জ্ঞানে সেবাকেই একমাত্র পথ বলিয়া জানিবে। এই পথ সুবর্ণ-পথ না হইতে পারে কিন্তু ইহা স্বর্গপথ।" এই সময়ে স্বামীজীর নির্দ্দেশে অতঃপর "দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার-সমিতির" নাম হইল "সেবাশ্রম।" নব্য ভারতের কর্ম্ম এবং ধর্ম্মজীবনের নেতা আচার্য্যদেব স্বামী বিবেকানন্দজী তৎপর আরও কিছুদিন কাশীধামে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার অবস্থান কালে সেবাশ্রমের কর্ম্মীদিগের মধ্যে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির ত্রিধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। কর্ম্মিগণ সেই পরম পুণ্যভাবের জলে অবগাহন করিয়া যেন জ্যোতি-র্মণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। বিশ্বমানবের স্বার্থগন্ধহীন নিষ্কাম প্রেম-ধর্ম্মই যে সর্ব্বযুগের এবং বিশেষতঃ এই যুগের সনাতন ধর্ম্ম-সেবকগণ আচার্য্যদেবের নিকট এই শিক্ষালাভ করিলেন। ক্ষুধার্ত্তের মুখে অন্ন তুলিয়া দিয়া, আর্ত্তের প্রাণপণ সেবা করিয়া, বিদ্যাহীনকে বিদ্যাদান করিয়া, সর্ব্বভূতে সেই নারায়ণ সেবা দ্বারাই তপস্যা-দুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান এই মানুষের কাছে সুলভ হইয়া থাকে, তাহা আচার্য্যদেব স্বামীজীর কাছে তাঁহারই মঙ্গলময়ী নির্ভয়-বাণীতে সেবকগণ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে ধরিতে পারিয়া ধন্য হইলেন। কর্ম্মশক্তি এবং চৈতন্য যেন একীভূত হইয়া সেবকদিগকে নির্ভীক ও কর্ম্মোন্মুখ করিয়া তুলিল। তাঁহারা দৃঢ়চিত্ত হইয়া আপনা-দিগের হৃদয়ে কর্ম্মের মন্ত্র যেন অগ্নির অক্ষরে লিখিয়া লইলেন। সেবকগণের প্রার্থনায় সেই সময়ে সমিতির পক্ষ হইতে

স্বামীজী একখানি আবেদন-পত্র ইংরাজীতে বলিয়া দিয়াছিলেন। তাহার বঙ্গানুবাদ এই :—

"কমিটীর গত বৎসরের কার্য্য-বিবরণী আপনাদের গ্রহণের জন্য নিবেদন করিলাম। এই বিবরণীতে অত্র সহরের (কাশীধামের) বহুসংখ্যক স্বজাতীয়, বিশেষতঃ বার্দ্ধক্য-প্রপীড়িত নরনারীর দুর্দ্দশার প্রশমন-কল্পে আমাদের দীন চেষ্টার বিবৃতি আছে।

আজকাল জ্ঞানের পূর্ণ জাগরণের এবং জনমতের ক্রম-প্রতিষ্ঠার দিনে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থগুলি, তাহাদের আধুনিক অবস্থা এবং কর্ম্মপদ্ধতি সমালোচকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই এবং হিন্দুদের পবিত্রতম স্থান এই পুরাতন সহরকেও ঐ সমালোচনার যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

জনসাধারণ অন্যান্য পবিত্র তীর্থস্থানগুলিতে পাপক্ষালনের দ্বারা আপনাকে বিশুদ্ধ করিতে চায়। তজ্জন্য সেই পবিত্র স্থানগুলির সহিত তাহাদের সংশ্লিষ্টতা নৈমিত্তিক এবং অল্পদিনের জন্য; কিন্তু এই সহরে—আর্য্যগণের ধর্ম্মানুষ্ঠানাদির প্রাণপূর্ণ এই সজীব কেন্দ্রে, বহু নরনারী—বিশেষতঃ জরা ও বার্দ্ধক্যক্লিষ্ট ব্যক্তিগণ আসিয়া শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মৃত্যুস্বরূপ শ্রেষ্ঠ পাবক দ্বারা অক্ষয় মুক্তিলাভের আশা করেন। এতদ্ভিন্ন জগৎ-সংসারের হিতকল্পে সর্ব্বত্যাগী মহাত্মারাও এই সহরে বাস করেন। তাঁহারা আত্মীয়-

স্বজনের অথবা বাল্যবন্ধুগণের সহায়তা হইতে চিরকালের জন্য বঞ্চিত। মহান্ হইলেও তাঁহারা শারীরিক ব্যাধিরূপ সাধারণ বিপদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান না। হইতে পারে, এই স্থানে পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের বিশেষ ত্রুটি আছে, হইতে পারে, পুরোহিতগণের উপর যে ভর্ৎসনা-বাক্য উচ্চারিত হয়, তাহাঁরা অনেক বিষয়ে তাহা পাইবার যোগ্য। তথাপি 'যাদৃশ জনসাধারণ, তাদৃশ পুরোহিত' এই মহাবাক্য আমরা যেন বিস্মৃত না হই; দুর্গতির দ্রুত প্রবাহ ভাসমান নরনারী, শিশু, সর্ব্বত্যাগী ও গৃহী, সকলকেই যে সেই এক সহায়শূন্য দুঃখ-কষ্টের আবর্ত্তে চক্ষুর সম্মুখ দিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহা যদি জনসাধারণ বদ্ধাঞ্জলি হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া কেবল দেখিতেই থাকেন এবং সেই সর্ব্বগ্রাসী প্রবাহ হইতে কাহাকেও উদ্ধার করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া, তীর্থস্থানগুলির পুরোহিতাদির অপকর্ম্মের বিষয়ই তারস্বরে জানাইতে থাকেন, তাহা হইলে সেই দুঃখ-কষ্টের কণামাত্র কখনও হ্রাস হইবে না। অথবা একটি প্রাণীরও সাহায্য হইবে না। এই অমর শিবধামের মোক্ষ-প্রদায়িনী শক্তির বিষয়ে আমাদের পিতৃপুরুষগণের যে বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল, তাহা কি আমরা রক্ষা করিতে চাই? যদি সত্যই ইহা চাই, তাহা হইলে এই শান্তিধামে আসিয়া দেহাবসানকরণাভিলাষী লোক-সংখ্যা প্রতিবৎসর অধিক হইতে অধিকতর হইতেছে দেখিয়া আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।

পরমপিতা পরমেশ্বরের অপার করুণা কীর্ত্তিত হউক, যে দীন-দরিদ্রের মধ্যেও মোক্ষলাভের প্রবল বাসনা আরও গভীরভাবে বদ্ধমূল রহিয়াছে, সেই দীন-দরিদ্রের মধ্যে যাহারা এখানে দেহাবসান করিতে আসে, জন্মস্থানে থাকিলে যে সহায়তার আশা তাহারা রাখিত, তাহা হইতেও তাহারা স্বেচ্ছায় নিজেকে বঞ্চিত করিতে প্রবৃত্ত এবং যখন তাহারা ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন তাহাদিগের সেই দুরন্ত অবস্থার অনুভূতি ও তন্নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ আপনাদের (যেহেতু আপনি একজন হিন্দু ভ্রাতা) নিজের কল্পনাশক্তি ও বিবেক বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলাম।

ভ্রাতঃ! চির শান্তিলাভের এই আশ্চর্য্য সাধনা-ভূমির অলৌকিক আকর্ষণের বিষয় স্থিরভাবে চিন্তা করুন। এই যে আবহমানকাল ব্যাপিয়া অনন্ত তীর্থযাত্রীর প্রবাহ মৃত্যুর ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে, তাহা ভাবিলে কি আপনার হৃদয়ে অনুভূতিগম্য এক নিগূঢ় ভক্তিমিশ্রিত বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না? যদি সত্যই তাহার উদ্রেক হয়, তবে অগ্রসর হউন—আমাদিগকে সাহায্য করুন। আপনার দান যদি কপর্দ্দকমাত্রও হয়, আপনার সাহায্য যদি যৎকিঞ্চিৎ হয়, সে জন্য সঙ্কোচের কোন কারণ নাই; তৃণগুচ্ছ একত্র হইয়া রজ্জুতে পরিণত হইলে, তাহা মত্তমাতঙ্গকেও আবদ্ধ করিয়া রাখে।”

স্বামীজীর এই আবেদন যেন কোন মন্ত্রশক্তির মত

সাধারণের হৃদয়ে নিষ্কাম কর্ম্মের জন্য ব্যাকুল-বাসনাকে জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। আশ্রমের কর্ম্মক্ষেত্রও ক্রমে বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর হইতে চলিল। তখন আশ্রম-পরিচালক সেবকগণের মনে উদয় হইল যে, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আদর্শ করিয়াই যখন তাঁহারা এই অনুষ্ঠানটির পরিচালন করিতেছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের সহিত, জনহিতকর এবং সাধনকেন্দ্রস্বরূপ এই সেবাশ্রমের সংযোগ হইলে সকল দিকেই উহার সার্থকতা হয়। সেবকগণ তখন আপনাদের মধ্যে এই বিষয়টির আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন,—ইহাই উত্তম এবং ইহাই ভবিষ্যতে আমাদের জীবনের কল্যাণের পক্ষে ও সাধারণের মঙ্গলার্থে জন্য বিশেষ সুযোগ।

তদনুযায়ী "কারমাইক্যাল্ লাইব্রেরী"-গৃহে ১৯০২ সালের ২৩ শে নভেম্বর তারিখে সমিতির সভ্য এবং পৃষ্ঠপোষকগণের একটি সাধারণ সভা আহূত হইল। অধিবেশনে অনেকেই এই প্রস্তাবটির অনুমোদন করিয়া বলিলেন যে, "ভারতের এমন একটি অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানটির সংযোগ হওয়া ত আনন্দেরই কথা। এমন কি, এইরূপ করিয়াই রামকৃষ্ণমিশন কেন্দ্র হইতে আবার এ দেশে সনাতন ধর্ম্ম এবং বেদান্তের অক্ষয় সত্যের পুনঃ প্রচারের পথ খুলিয়া যাইবে।" তখন অধিকাংশের সানন্দ সম্মতিতে আশ্রমের পরিচালন-ভার এবং সম্পূর্ণ ক্ষমতা সেই সময় হইতে

শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের হস্তে অর্পিত হইল এবং সমিতির নাম— "শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রম" হইল।

আজ মানবত্তারণ ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র নাম সংযুক্ত হইয়া কাশীধাম রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রম যেন তাহার আকাঙ্ক্ষিত সত্যের গৈরিক নিশান উড়াইয়া দিয়া পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে নূতন ধর্ম্ম-জীবনের সূচনা দিতে আরম্ভ করিল। আর এইটুকু সার্থকতার জন্য সেবকদিগের অন্তঃকরণ যেন সকল বন্ধনমুক্ত হইয়া, এক অসীম সুন্দর এবং দৃঢ় কর্ম্মানন্দের বিপুলতায় প্রসারিত হইয়া উঠিল।

দিনে দিনে আশ্রমের কার্য্য সুচারুরূপে এবং সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে উন্নতির পথে চলিতে লাগিল। স্থানীয় অনেক হৃদয়বান্ এবং বিখ্যাত ব্যক্তিগণকে লইয়া "রামকৃষ্ণ-মিশন" কর্ত্তৃক একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হইল এবং আশ্রমের একটি সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়া সেবকগণের কার্য্যের ব্যবস্থাকে অতিশয় সুগম করিয়া দিল। অদ্যাবধি সেই নিয়মেই কার্য্য-নির্ব্বাহ হইতেছে।

পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দজীর অলোকসামান্য ত্যাগ ও চরিত্রবলে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বস্বত্যাগরূপ পন্থার অনুসরণ করতঃ পাশ্চাত্য দেশবাসিনী মহাপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতা দুঃখদারিদ্র্য-পীড়িত ভারতের কল্যাণের জন্য আমাদিগের মধ্যে আসিয়া আত্মত্যাগরূপ সেবাব্রতের সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই মহাপ্রাণা রমণীর অসামান্য

সাধনার ফলই কলিকাতার বাগবাজারে প্রতিষ্ঠিত 'নিবেদিতা স্কুল।' তিনি প্রায় ত্রয়োদশ বর্ষ কাল কঠোর তপস্যা, অপূর্ব্ব নিষ্ঠা, দৃঢ় অধ্যবসায় এবং তন্ময় ধ্যানে রত থাকিয়া সর্ব্বদা আপন লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন,—ইহা যাঁহারা তাঁহার জীবন-কথা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন। তিনি তাঁহার জীবনকালের শেষ ভাগে কিছুকাল ৺কাশীধামে অবস্থান করিয়া সেবাশ্রমের সেবকদিগের এবং আশ্রমের উন্নতিকল্পে বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার মধুমাখা লেখনীর প্রভাবে এই ক্ষুদ্র আশ্রমের কথা বহু দূরবর্ত্তী শিক্ষিত জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। আশ্রমের সেবকগণ এবং আশ্রমবাসী আশ্রিতগণ এই মহাপ্রাণা মহিলা—ভগিনী নিবেদিতার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধিকারে আসিবার পর হইতে সেবাশ্রমের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। সেবাশ্রম যখন কেবলমাত্র কয়েকটি যুবকসঙ্ঘের অনুষ্ঠানই ছিল, তখন শুধু কয়েকজনের সম্মিলিত কার্য্যের উপরে সর্ব্বসাধারণের তেমন লক্ষ্য পড়ে নাই। এখন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের হস্তে আসাতে লোকচক্ষুর প্রখর ও স্নেহদৃষ্টি দুইই অধিক ভাবে এই আশ্রমের প্রতি পতিত হইতে লাগিল। লোক-চক্ষুর দৃষ্টিতে উহার ভাল দিক এবং মন্দ দিকের মাত্রা অধিকভাবেই পতিত হইতে লাগিল। তজ্জন্য কতদিক হইতে কত সময় বিপুল বাধা এবং বিপত্তি যে মিশনের এবং সেবা-শ্রমের অধ্যক্ষদিগকে ঠেলিয়া চলিতে হইয়াছে, তাহা এক জানেন বিশ্বনাথ, আর জানেন—যাঁহারা ঐ বাধাকে বুক দিয়া ঠেলিয়া অপসারিত করিয়াছেন, তাঁহারা, কিন্তু আশ্রিতজন কোন দিন ঘুণাক্ষরেও ঐ সকল বাধার কথা জানিতে পারেন নাই। এই টুকুই আশ্রম-কর্ম্মের সমস্ত সার্থকতা। সেবকগণ তাঁহাদের জীবনের সমস্ত সুখাশাকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত এই সেবাকার্য্যে বিলাইয়া দিয়াছেন। বাধা-বিঘ্ন, ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতির মধ্যেও "যাঁহার" সেবা "তাঁহারই" কৃপায় ঐ সাধনার ভাবটিকে অক্ষয়ভাবে

নিরন্তর রক্ষা করিতে সেবকগণ সমর্থ হইয়াছিলেন। এক এক সময় ঐ সেবকগণের প্রাণের শক্তি এবং তপস্যার বলকে পরীক্ষা করিবার জন্য কত বিপত্তি যে আসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা ঐ সকল কথা পূজনীয় চারুচন্দ্রের মুখে বহুবার শুনিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের জীবন-বিলান কর্ম্ম এবং হৃদয়-ঢালা প্রেমের কাছে সে বিপত্তি আপনি হারিয়া গিয়া অবশেষে আনন্দের হাসিতেই পরিণত হইয়াছে।

ধীরে ধীরে আশ্রম-দর্শকগণের আগমনও বাড়িয়া চলিতেছিল এবং স্থানীয় মহানুভাবগণ—যাঁহাদের সাহায্যে এখানকার কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মের পরিস্থিতি, ক্রমে আপনা হইতেই প্রসারিত হইতেছিল, এই উভয় প্রকার পুণ্যাত্মাদিগের হৃদয়ভরা সহানুভূতিতে আশ্রমে নর-নারায়ণের ভবিষ্যৎ পূজার আয়োজন ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কতরূপে যে তাঁহারা তাঁহাদিগের সেবা বা সাহায্য—কেহ গোপনে, কেহ বা প্রকাশ্যে দিতে আসিতে লাগিলেন, তাহার সমস্ত কথা লিখিবার সুযোগ এখানে নাই; এবং সে বস্তু সমগ্রভাবে লিখিয়া জানাইবার মত ক্ষুদ্র বিষয়ও নহে। এইরূপে সর্ব্বসাধারণের সহানুভূতিতে প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকারিতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে চলিল। আশ্রম-কার্য্যও ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কাজেই, তখন আশ্রমের আয়তন বৃদ্ধিরও আবশ্যকতা সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধ হইতে লাগিল।

যে সকল বৃদ্ধ এবং অথর্ব্বগণ জীবনের শেষ দিনগুলি

আশ্রমে অতিবাহিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া তথায় আশ্রয় লইতেন, এতদিন তাঁহাদের সহিত এবং পীড়িতগণের সহিত আশ্রম-কর্ম্মিগণ একই গৃহে দিন কাটাইতেন। সকল সময়ে রুগ্নগণের সহিত সেবকদিগের একত্র বাস করা উচিত নহে, কিন্তু তাঁহারা স্থানাভাবে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। বিসূচিকা, ক্ষয় রোগ প্রভৃতি বহুপ্রকার কঠিন সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্তদিগের সহিতও অহর্নিশি তাঁহারা একত্র মেলা-মেশা করিতে বাধ্য হওয়ায় বহু বিপদও তাঁহাদিগের মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা এতকাল তাহা গণনার মধ্যেই আনেন নাই। এখন পীড়িতের সংখ্যাধিক্যের জন্য সেবকদিগের সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন-বোধও তাঁহাদিগকে সচেতন করিল। তাহা ছাড়া বিভিন্নপ্রকার রোগগ্রস্ত এবং আতুরগণের জন্য যে স্বতন্ত্র বাসস্থানের বিশেষ প্রয়োজন, তাহাও ক্রমশঃ তাঁহারা অনুভব করিলেন। বিশেষতঃ চিকিৎসকেরা এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখও বারবার করিতে লাগিলেন।

কাশীধামের (বরুণা ও অসীর) বাহিরে চৌকাঘাট নামক হাঁসপাতালটি ছাড়া সংক্রামক রোগীদিগের জন্য অন্য কোনই আশ্রয় ছিল না; ঐ হাঁসপাতালেও চিকিৎসার এবং শুশ্রূষার বন্দোবস্ত পর্য্যাপ্ত ছিল না; বিশেষতঃ হাঁসপাতালে রোগী-দিগের আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদিগকে উপস্থিত থাকিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিবার কোন সুযোগই সেখানে দেওয়া হইত না, শুধু তাহাই

নহে, দেওয়ার কোন সুবিধাও ছিল না। এই সমস্ত কারণে ঐরূপ রোগীদিগের অভাব-মোচনেচ্ছায় সেবকগণ আশ্রম মধ্যে নিরাশ্রয় সংক্রামক রোগীদিগকে আশ্রয় দিতে দৃঢ়-সংকল্প হইলেন। এই সংকল্পের ফলে আশ্রমের আয়তন-বৃদ্ধির আবশ্যকতা বিশেষরূপে ঘটিয়া উঠিল; তখন মিশনের সভ্যগণের সহিত কর্ম্মিগণ এ বিষয়ের পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

কিরূপে কাহার মনে কোন্ ভাবের সাহায্য আশ্রম সেবকগণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, তাহার আভাষ পূর্ব্বে কেহই বুঝিতে পারেন নাই। সাহায্য লাভেচ্ছায় একটি যত্নের ধারা যদিও মিশন-কর্ত্তৃপক্ষ এবং সেবকদিগের হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়া উৎসাহ-নদীর দুই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিতেছিল, তবুও চেষ্টার অপেক্ষা সদিচ্ছা-পূর্ণকারী শ্রীভগবানের দয়ার বর্ষণ যেন অধিকতর কার্য্যকর বলিয়া বোধ হইল।

ধীরে ধীরে সেবকগণের ঐকান্তিক ইচ্ছা পূর্ণ হইবার পথও দেখা দিতে লাগিল। কলিকাতার ইটালী-নিবাসী উদারহৃদয় উপেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয় আশ্রম-নির্ম্মাণার্থে জমি ক্রয়ের জন্য এককালীন ৪০০০৲ চারি সহস্র মুদ্রা সর্ব্ব প্রথম সাহায্য দান করেন। এই মহানুভাব পুরুষ ইতিপূর্ব্বে কোন্ পবিত্রক্ষণে যে আচার্য্যদেব বিবেকানন্দজীর সংস্পর্শে আসিয়া এইরূপ বহুজনহিতকর ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন,

তাহা আমরা জানি না। ইহারই অব্যবহিতকাল পরে হুগলী জেলার বংশবাটী-নিবাসী মহাপ্রাণ তারিণীচরণ পাল মহাশয়ও তাঁহার আজীবন সঞ্চয়ের অঞ্জলি দুই সহস্র ২০০০৲ মুদ্রা সাহায্যরূপে নীরবে আসিয়া চারুচন্দ্রের নিকটে অর্পণ করিয়া বহু উদারহৃদয় ব্যক্তিকে দানের প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেন। তাঁহাদেরই অন্তরের শ্রদ্ধানদী ফল্গুধারার মত অদৃশ্যে আসিয়া আজ আশ্রমের প্রথম অভিষেক সম্পাদিত করিল। আশ্রম-অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র এই দুইটি অনির্ব্বচনীয় মহৎ দান লইয়া, আশ্রম নির্ম্মাণের জমি ক্রয় করিবার জন্য সেবকগণের সহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বহু অনুসন্ধানে চারুচন্দ্র লাক্সা পল্লীতে প্রায় পাঁচ বিঘা বিস্তীর্ণ বাগান সহিত একটি জমির সন্ধান পাইলেন এবং তাহা সেবাশ্রমের জন্য মনোনীত করিয়া, রামকৃষ্ণ-মিশনের সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজীকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাকে কাশীধামে আসিবার জন্য আমন্ত্রণও করিলেন। কলিকাতা হইতে সারদানন্দজী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎকালে পূজ্যপাদ শিবানন্দজী মহারাজও কাশীধামেই ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের এবং সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে অবশিষ্ট অর্থও সংগৃহীত হইয়াছিল এবং জমিক্রয় প্রভৃতি বিষয় সমস্তই সুসম্পন্ন হইয়া গেল,—তখন ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ চলিতেছিল।

সেবকদিগের হৃদয় ও কর্ম্মের ব্যাকুলতা, নিজেদের আত্ম-নির্ভরতা ও মহাপুরুষ মহাজনগণের উৎসাহের স্পর্শ—এই

সমস্ত মিলিয়া যেন বলিয়া দিতেছিল, "সম্মুখের দূর পথ নিকটতর হইয়া আসিয়াছে,—কর্ম্মক্ষেত্রে বেদান্তের পতাকা উড়িয়াছে, আর নিরাশা নাই এবং আর ভয় নাই"।

অনাথ আতুরদের হৃদয়-মন্দিরে বসিয়া যিনি তাঁহাদিগের জীবন ফিরাইয়া আনিয়া দিতেছেন, তিনিই তাঁহাদের আশ্রয়ও গড়িয়া তুলিবেন। ভরসা-বাঁধা বুকে মহৎ কার্য্যের এই পূর্ণ বল লইয়া তখন সেবকগণ সাধারণে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। মিশনের সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের এবং সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর সবিশেষ চেষ্টা তাহার সহিত মিলিত হইয়া সেবকদিগের উৎসাহকে অতিশয় প্রবল করিয়া তুলিল। দেখিতে দেখিতে সত্বরেই উহার শুভফল ফলিতে আরম্ভ করিল।

কত মহানুভব, যাঁহারা এতদিন হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত ব্যথার ধারা কোন যোগ্য সংস্থানে ঢালিয়া তাহার উপশম করিতে পারিয়া উঠিতেছিলেন না, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র, তাঁহাদের সান্ত্বনার ভূমি আজ পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর আহ্বানে এবং নিয়মে ও অনুষ্ঠানে এই সেবাশ্রমে উন্মুক্ত হইয়া গেল। কত পরদুঃখকাতর হৃদয়বান্ সদাশয় ব্যক্তি আপন আপন মৃত আত্মীয় বান্ধবগণের স্মৃতি-তর্পণের স্থায়ী ব্যবস্থায় হৃদয়বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার একটি সুযোগ আজ এইখানে পাইলেন। কত শোকগ্রস্তের শোক-ব্যথার নয়নাশ্রু আজ মুক্তার মালা হইয়া এইখানে

চিরস্থায়ী সদ্‌ভাব-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবার ভূমি পাইল! কত ব্যথাতুর উৎসুক হৃদয়, কত দয়ার্দ্র উদার হৃদয় আজ এই পবিত্র ভূমিখণ্ডে আপনাদিগকে বিলাইয়া দিবার সাধনায় ধন্য হইল! জননয়নের অগোচর নিভৃত কন্দরে যাঁহাদের প্রযত্নসঞ্চিত অর্থসম্ভার জন-নারায়ণ-সেবার জন্য সঞ্চিত ছিল, আজ তাঁহাদের সেই রুদ্ধকন্দরের দ্বার খুলিবার দিন আসিল। প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষার জন্য, নরনারায়ণের পূজার জন্য, সেবা-শ্রমের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নির্ম্মাণার্থ মহাপ্রাণদের অর্থ-সাহায্য ক্রমেই অধিকভাবে আসিতে লাগিল। সুতরাং নানারূপে বিশ্বজনীন প্রেমরূপ মহাসাগরের দিকে ভক্ত-মানস-সরোবরের কমলগুলি ভাবনদীর সাহায্যে ভাসিয়া ছুটিতে লাগিল। সার্থক তাঁহারা, সার্থক আমাদের এই দেশ, সার্থক সনাতন বেদান্তের পরম-গহন মধুর গভীর বাণী। সার্থক জীবন সেই সেবকগণের, যাঁহাদের অন্তরে অমৃতের অক্ষয় উৎস সঞ্চিত রহিয়াছে।

এইরূপে নর-নারায়ণের সেবামন্দির পলে পলে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই যুগের পরম শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্ম, পরম শ্রেষ্ঠ-কর্ম্ম এবং মানবত্বের পূর্ণতার পূর্ণ পরিচয়—দান ও সেবা। এই দান ও সেবাধর্ম্মের যুগোচিত ভাবে নূতন মূর্ত্তিপরিগ্রহের দিন আজ বারাণসীতে আসিল। স্বয়ং বিশ্বনাথ তাঁর আশীর্ব্বাদের ভাণ্ডার-ঝুলি আর্ত্ত মানবের জন্য বুঝি-বা এইখানেই খুলিয়া দিলেন।

পাখীর সুমধুর কাকলীতে, মায়ের সেবা-গানের মধুর

সুরগুলি শুনিয়া লাক্সা-পল্লীবাসীরা আজিকার উষায় জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বর্ণ-কিরণ সূর্য্যের প্রথম আলো বৃক্ষপত্রের মধ্য দিয়া আশ্রম-ভূমির তৃণরাশিকে চুম্বন করিতেছে। দূরে শিশুর দল মাতৃক্রোড় হইতে পৃথিবীর বুকে নামিয়া তাহাদের খেলার আনন্দ-কোলাহল তুলিয়াছে। পল্লীবাসিগণ আজ তাহাদের প্রভাতের কাজ ভুলিয়া আশ্রম-ভূমির চতুর্দ্দিকে ক্ষণকালের জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল রৌদ্রোজ্জ্বল সুনীল আকাশের নীচে আশ্রম-সেবকগণ, আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ ও রামকৃষ্ণ-মিশনের পূজ্যপাদ সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ—অপরাপর সন্ন্যাসী এবং ভক্তগণের সহিত তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। চারিদিকে একটি বিশুদ্ধ উল্লাসের রেখা যেন সকলের বুকেই স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। সুন্দর গভীর অনবদ্য আনন্দের প্রফুল্ল হাস্যের সেই দিনে স্বামীজী মহারাজজী-কর্ত্তৃক আশ্রমভিত্তি স্থাপিত হইল। চারিদিকের জনগণের নয়ন হইতে যেন আনন্দের অশ্রুমালা লাক্সার ভূমিতলে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বারাণসীক্ষেত্রে দীন-দুঃখিগণ এবং স্থানীয় ভদ্রজনগণ, যাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আসিয়া আজ এই পুণ্যভূমি স্পর্শ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

স্বামী শুভানন্দ (চারুবাবু)

নবম অধ্যায়।

ক্রমে দীর্ঘ দুই বৎসর চলিয়া গেল। মহানুভাব দাতৃগণের মুক্তহস্ততায় এবং সেবকগণের ব্যাকুল কামনায়, বিশেষতঃ পূজনীয় অচলানন্দজীর অক্লান্ত যত্নে ও পরিশ্রমে এবং পূজাপাদ বিজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর তত্ত্বাবধানে এই দুই বৎসর কালের মধ্যে আশ্রম-নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইল।

দুই বৎসর পূর্ব্বে যেখানে জীর্ণ বাগানের অবশেষ এবং কণ্টকের বন অবস্থিত ছিল—আজ সেই ভূমির উপরে কত অনাথ আতুরের সেবার মন্দিরগুলি প্রভাতের মুক্ত আলোকে গৈরিক বেশে হৃদয়ের স্বাগত আহ্বান লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আশ্রম-নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন হইবার অল্প দিন পরেই ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে আশ্রম উন্মুক্ত করিবার দিন ধার্য্য হইল। সেবকদের মন সেই শুভক্ষণের সুন্দর দিনটির জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঐ আশ্রম দর্শনে তাঁহাদের মনের মধ্যে গতকালের এবং ভবিষ্যতের কত স্মৃতি ও কল্পনা যে কিভাবে উত্থিত হইতেছিল, তাহা বুঝিবার শক্তি কার? ১৬ই মে শুদ্ধচিত্ত সেবকদিগের মধ্যস্থলে আশ্রম-মন্দিরের দ্বারে পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমহারাজ ব্রহ্মানন্দজীর উন্নত শীর্ষ দেখা গেল। গম্ভীর-সুন্দর উৎসবের মধ্যে আশ্রমের গৃহগুলি ঐদিন উৎসর্গীকৃত হইল।

সেদিন আশ্রমের সুসজ্জিত সভা-শোভা দেখিয়া মনে হইতেছিল, যেন সেবকের দল মায়ের রাঙ্গা পদতলে বসিয়া তাঁহার অপার করুণার উৎস প্রতীক্ষা করিতেছেন।

আশ্রম উৎসর্গ সম্পন্ন হইলে শ্রীশ্রীমহারাজজী সেবক-দিগকে আবার নবভাবে উৎসাহিত করিয়া এবং নানা প্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়া, সানন্দ হৃদয়ে বেলুড় মঠে ফিরিলেন। আজ বারাণসীর পুণ্যক্ষেত্রে, দরিদ্র-দুঃখীদের জন্য প্রকাশ্যে আশ্রয়-মন্দির হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়াইল ;—এস, কে আছ আতুর, কে আছ অন্ধ, কে আছ দীন, আজ মা-ভৈঃ রব, আজ হৃদয়ের স্নেহ-যত্ন, আজ প্রাণঢালা স্বাধীন সেবা-শুশ্রূষা তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। এ তোমাদেরই গৃহ, এ তোমাদেরই একান্ত আপন ঠাঁই।

সেবকগণ মিলিত হইয়া অতঃপর ৬ই জুলাই একটি সাধারণ সভার অনুষ্ঠান করিলেন। সেই দিন বিপুল জন সমাগমের মধ্যে সেই সভার অধিবেশনে লাক্সা পল্লী অপূর্ব্ব ভাব ও শ্রীধারণ করিল। সভার অধিবেশনান্তে বারাণসীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার গ্যাস্কেল আশ্রমের প্রধান কর্ম্মগৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে সাগর-পার হইতে আগত বৈদেশিক রাজপুরুষের হৃদয় এই দ্বার উদ্ঘাটন সময়ে এমনই বিহ্বল হইয়াছিল যে, তিনি এই আশ্রম কর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে আশ্রমের হাঁসপাতাল বিভাগটি

ছয়টি সাধারণ পীড়িতের এবং তিনটি সংক্রামক রোগীর —মোট নয়টি বিভাগে ৪৬ ছয়চল্লিশটি রুগ্নের স্থান সঙ্কুলানের উপযোগিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বহির্বিভাগে ঔষধ বিতরণের জন্য স্থান এবং ঔষধালয়, পাঠাগার প্রভৃতি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। দ্বার উদ্‌ঘাটনের পর হইতেই বারাণসীর সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিষ্টার গ্যাস্‌কেল আশ্রমের প্রতি বিশেষ যত্ন ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি অবিলম্বে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি হইতে বার্ষিক ১২০৲ এক শত কুড়ি টাকা সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আশ্রমের একান্ত ধন্যবাদার্হ হন এবং ইহার পরে তিনি মিউনিসিপ্যালিটিকে আশ্রমের উক্ত সাহায্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিয়া দিতে এবং হাঁসপাতাল-গৃহকে টেক্সের দায় হইতে মুক্তি দিতে প্রবৃত্ত করাইয়া মিশনকে চির-কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।

এইরূপে আশ্রম এখন একটি বৃহৎ স্থায়ী অনুষ্ঠানে পরিণত হইতে চলিল। আশ্রমের কর্ম্মীর সংখ্যা ইহার বর্ত্তমান প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রের তুলনায় অতি অল্প বোধ হইতে লাগিল। কেননা, এখনও একই ব্যক্তির উপরে বিবিধ কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকিত। তাহাতে কাজের অনেকপ্রকার অসুবিধা ঘটিবার উপক্রম হইল। আশ্রমাধ্যক্ষ চারুবাবুকেই আশ্রম পরিচালন এবং আরও অনেক কাজ নিজ হস্তেই করিতে

হইত। এজন্য আশ্রমকার্য্য পরিচালনায় কর্ম্মীর অভাব বিশেষরূপে অনুভূত হইতে লাগিল। কলিকাতার প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ হইতেও বিশেষ কর্ম্মীর সাহায্য মিলিত না। কারণ, তৎকালে সেখানেও কর্ম্মীর সংখ্যা পর্য্যাপ্ত ছিল না। ইত্যাদি নানা কারণে অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র স্থির করিলেন, অতঃপর স্থানীয় লোকদিগের মধ্য হইতেই নূতন কর্ম্মীসকল গড়িয়া তুলিতে হইবে। পূর্ব্বে অনেক সহৃদয় যুবক আপনা হইতেই আসিয়া আশ্রমে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা ছাড়া আরও যাঁহারা আশ্রমের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাঁহারা তাঁহাদের অবসর সময়টুকু মাত্র দিতে পারিতেন; এখন আশ্রমের কার্য্য এতই বাড়িয়া উঠিয়াছে যে, হৃদয়বান্ আত্ম-নিয়োগকারীদের অবসর সময়ের কাজও বর্ত্তমান কর্ম্মক্ষেত্রের পক্ষে প্রচুর বলিয়া বোধ হইতেছিল না। এই জন্যই নূতন কর্ম্মীর একান্ত প্রয়োজন বোধ হইল।

সেবাশ্রমে যখনই প্রয়োজনের ডাক পড়িয়াছে, তখনই সেবকের প্রভু সে প্রয়োজন পূরণের পথ করিয়া দিয়াছেন। বাংলাদেশে জাতীয়তার সাড়া পড়িবার দিন হইতেই যুবক-গণের অন্তরে প্রাচ্যভাবের ও স্বাদেশিকতার এক নূতন প্রেরণা আসিয়াছিল। সে প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ যুবকবৃন্দ যখন প্রাচ্যভাব-সম্পৃক্ত কোনও নূতন অনুষ্ঠান দেখিতে পাইতেন, তখনই তাহাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া যেন শান্তি পাইতেন। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশের যুবকবৃন্দের

মধ্যে যাঁহারা কাশীধামে চারুবাবুর সংস্পর্শে এবং কর্ম্মপথে আসিয়া মিলিত হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই সেবাশ্রমের অভিনব মহৎ কর্ম্মে চারুবাবুর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আত্মার মধ্যে এক নূতন আলোর সন্ধান পাইয়া ও মুগ্ধ হইয়া ঐ জনহিতব্রতে তাঁহাদের জীবনকে উৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং আশ্রমের কর্ম্মিরূপে আশ্রম-সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া স্বাদেশিকতার সত্য এবং শ্রেয়ঃ পথের সন্ধানলাভে ধন্য হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা উচ্চতর ভাবুক, তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগকেই ঈশ্বরলাভের পরম পথ জানিয়া গভীর শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সহিত আপন আপন জীবনকে এই বিশাল কর্ম্ম-প্রবাহে ঢালিয়া দিলেন। যাঁহারা ভারতের নানা সুদূর প্রদেশ হইতে ৺বিশ্বনাথ দর্শন মানসে বারাণসী ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া এবং পীড়িত হইয়া পড়িয়া আশ্রমের কর্ম্মীদের সেবাশুশ্রূষা এবং সংস্পর্শ দ্বারা যুগপৎ শরীরে ও মনে আরোগ্যলাভ করিতেন—বিভিন্ন প্রদেশবাসী সেই সমস্ত হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণের মধ্যেও কেহ কেহ অন্তরে এক নূতন প্রেরণা পাইয়া জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি ঐ সেবকদিগের ন্যায় তাঁহাদেরই একজন হইয়া অতিবাহিত করিতে উৎসুক এবং অভিলাষী হইতেন। সেই অভিলাষ তাঁহাদের অন্তরের দেবতার দয়ায় কতক পরিপূর্ণ হইত। এই ভাবে এই তিন শ্রেণীর হৃদয়বান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে হইতে আশ্রমের নব

কর্ম্মিদল সংগঠিত হইতে লাগিল। এইরূপে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় সেবক-সমস্যার ধীরে ধীরে কিয়ৎ পরিমাণে সমাধান হইয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু, তাহাদিগকে কার্য্যে উপযোগী করিয়া তুলিবার আবশ্যকতা অধ্যক্ষ চারুবাবু প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন এবং আশ্রমের এই কঠিন বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া উঠিলেন। নবীন কর্ম্মীদের হৃদয় আছে, সামর্থ্যও আছে, কিন্তু ভাবের সম্পূর্ণতার অভাবেই কার্য্যে শৃঙ্খলার অভাব হইতেছিল। শিক্ষাদানের প্রচুর সময়ও তখন ছিল না। কিন্তু চারুবাবুর যে সকল সদ্‌গুণ ছিল, সেইগুলিতে আসক্ত হইয়া সকল সেবকই তাঁহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন এবং শ্রদ্ধা করিতেন। হয়ত চারুবাবু একথা অনেক সময় বুঝিতে পারিতেন না। তিনি সেবকদিগকে শিক্ষা দিবার এক স্বাভাবিক সহজ নূতন উপায় অবলম্বন করিলেন। শিক্ষকের ন্যায় উপদেশ দিয়া যে কাজ কখন সহজে শিখান যায় না, ভালবাসা দিয়া সেই শিক্ষার মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া একটি পথ ধরিলে, সকলেই অতি সহজে তাহা প্রাণের মধ্যে লইয়া থাকেন। তখন সকল কার্য্যেরই প্রাণ কর্ম্মীদের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্য দিয়া সহজেই জাগ্রত হইয়া উঠে। হয়ত চারুবাবু এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই তাঁহার স্বাভাবিক শক্তিপ্রভাবে অধ্যক্ষরূপে প্রত্যেক কর্ম্মীর নিকট হইতে যাহাতে তাহার হৃদয়টি অতি অল্পদিনে জয় করিয়া লইতে পারেন, সেইদিকে

সম্পূর্ণ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। শৃঙ্খলার দিকে যেমন তাঁহার খরদৃষ্টি, নিয়মানুবর্ত্তিতার দিকে তেমনিই তাঁহার সতর্ক ব্যবস্থা। যেমন কর্ম্মক্ষেত্রটিকে কর্ম্মীদের কাছে সুগম করিয়া তুলিলেন, তেমনি করিয়া তাহাদের কর্ম্মকেও নিয়ত জাগ্রত করিয়া তিনি আদর্শের দিকে চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু কেবল আদর্শপথ প্রদর্শন করাই তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য ছিল না। যে হৃদয় ও নীতি মানুষের মানুষ হইবার মূল বীজ, তাহাকেই তিনি সম্মুখে রাখিয়া নিজেকে সমস্ত কর্ম্মীর ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনের ভিত্তি-স্বরূপ করিয়া তুলিলেন। তাঁহার কি উৎসাহ, কি নিষ্ঠা, কি প্রাণময় সাধনা! "বড় যদি হ'তে চাও—ছোট হও আগে"—এক কথা কয়টিকে আপন ললাটে তিলক করিয়া তিনি কর্ম্মের নদীস্রোতে ঝম্প দিয়াছিলেন। দিন নাই, রাত্রি নাই, আত্মহারা সেই মানুষটি নিজেকে জনসাধারণের দাসানুদাস করিয়া দিয়াছিলেন, প্রত্যেক সেবকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এবং কর্ম্মপথের সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি উৎসুক ও ব্যস্ত হইয়া থাকিতেন।

ব্যথিতদের বেদনার রাশিকে এই ভাবে চারুবাবু সকলের প্রাণের পথের এবং কর্ম্মের পথের সেতুরূপে আপনার বুকের উপর দিয়া অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মি-জীবনের এ দৃশ্য, এ আলেখ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত ইহা বুঝিবার শক্তি আর কাহারও নাই। সকলকে মগ্ন করিয়া ও সকলের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যে কি অপূর্ব্বভাবে

আশ্রমের আনন্দরাজ্য, কর্ম্মরাজ্য ও নিয়মরাজ্য তিনি গড়িয়া তুলিতেছিলেন—তাহা ভাবিলে অতি-বড় সাধকেরও হৃদয় বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। যদিও তিনি একটি উদ্দেশ্য লইয়াই কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্প পরেই তিনি তাহা বিস্মৃত হইয়া গেলেন। "তিনি যন্ত্রী; আমি যন্ত্র"—এই ভাবই তাঁহার অন্তর ভরিয়া জাগিয়া উঠিল এবং অন্তরের সেই দৃঢ় বিশ্বাস ও বিশ্বাসের সেই বল যেমন কর্ম্মকে চারিদিকে সবল করিয়া তুলিল, তেমনই সকল বাধা-বিঘ্নরাশিও যেন ধূলির মত উড়িয়া যাইতে লাগিল। আর কোন বাধা—আর কোন বিঘ্নই তাঁহাকে লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হইল না। সেবকদিগকে নবীন বলে বল দান করিয়া এবং নিজেও আপন বলে বলীয়ান্ হইয়া আশ্রমকে আপনার উদ্দিষ্ট পথে তিনি এইভাবে পরিচালিত করিতে লাগিলেন।

আশ্রমের পরিচালনা প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি যেরূপ চিন্তা করিতেন, আর্থিক বিষয়েও তিনি সেইরূপ অতিশয় সতর্ক থাকিতেন। যাহাতে অতি অল্পব্যয়ে কাজ সাধিত হয় এবং চারিদিকের ব্যয় বৃদ্ধির মধ্যেও আশ্রমে অর্থকৃচ্ছ্রতা কোন ছিদ্রদিয়া প্রবেশ করিতে না পারে, সেজন্য সর্ব্বদা তিনি অবহিত থাকিতেন, তিনি অতিশয় মিতব্যয়ী ছিলেন. আশ্রমের ক্ষুদ্রতম একটি কপর্দ্দককেও তিনি আপন দেহের রক্ত-স্বরূপ মনে করিতেন। এবং কেহ কোনরূপে আশ্রমের একটি কপর্দ্দক অযথা ব্যয় করিবার কোন উপায় করিতে পারে, ইহার সম্ভাবনাকেও

তিনি অবসর দিতেন না। চারুবাবুর নিজের জন্য তাঁহার ভ্রাতৃগণ-প্রদত্ত পৈতৃক সম্পত্তির আয় হইতে মাসিক কিছু কিছু সাহায্য আসিত। তিনি তদ্দ্বারাই যাবতীয় ব্যক্তিগত ব্যয়—নির্ব্বাহ করিতেন। আশ্রমের অর্থ তাঁহার নিকট দেবতার-গচ্ছিত ধনের মত ছিল। তাহাকে শিরে বহন করা ব্যতীত নিজের জন্য কোন দিন তাহা হইতে কিছু ব্যয় জীবনে তিনি কখনও করেন নাই। তাঁহার নিজের যে অর্থের কথা বলা হইয়াছে, এমন কি, সময় সময় নিজের দিকে না তাকাইয়াও সেবকদিগের প্রীতির জন্য উহা হইতেও কিছু কিছু তিনি ব্যয় করিতেন। কিন্তু একথা সহজে কেহ জানিতে পারে নাই। আশ্রমের অর্থ সম্বন্ধে একটি ব্যবস্থার উল্লেখ এখানে করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেবকদের ভোজনান্তে মুখ-শুদ্ধির জন্য একটি লবঙ্গ স্থলে যদি কেহ কখনও দুইটি লবঙ্গ চাহিত, তিনি তাহাতে এই বলিতেন যে, আশ্রমের অর্থের আমি রক্ষক মাত্র। আপনার একটিমাত্র লবঙ্গ প্রাপ্য, আমি তাহার অধিক দিতে পারিব না এবং এই প্রকার কথা বলিতে তিনি আশ্রমের গুরু-লঘু কোন সাধুর প্রতি কোন আশঙ্কার ভাবও পোষণ করিতেন না। এই সমস্ত ঘটনায় আশ্রমের অর্থের প্রতি তাঁহার মিতব্যয়িতা, তাঁহার হৃদয়-বলের এবং আশ্রমের নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ পরিচয় যে দুই একবার পাওয়া যাইত, তাহা নহে। সর্ব্বকাজে

এবং সর্ব্বক্ষণই এইরূপ পরিচয় প্রকৃষ্টরূপে পাওয়া যাইত। অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার তো প্রখর দৃষ্টি ছিলই, এমন কি তিনি দৈনিক ৫।৭ পাঁচ সাতটির অধিক দেশলাইয়ের কাঠী পর্য্যন্তও তিনি আশ্রমের জন্য ব্যয় করিতে দিতেন না। এতদ্ব্যতীত আশ্রমের যে কোন ক্ষুদ্রতম অথচ অনাবশ্যক জিনিষটির বিনিময়ে যদি কোন প্রকার আয়ের ক্ষুদ্র পথও করা যায়—তাহার উপায়ও তিনি চিন্তা করিতেন। আশ্রমে যে সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক-পত্রাদি আসিত, তাহার মোড়ক এবং যে স্থান হইতে যত চিঠিপত্র আসিত, তাহার খামগুলি পর্য্যন্ত যাহা সাধারণতঃ একান্ত অকাজের জিনিষ, তাহাও তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে রাখিয়া দিতেন এবং আশ্রমের খস্ড়া লেখার যত কিছু কাজ, তাহা ঐ সকল মোড়ক ও খামগুলি দ্বারা সম্পন্ন করাইতেন; আর আশ্রম হাঁসপাতালের বহির্বিভাগে যে সকল ঔষধ বিতরণ করা হয়, সেই সকল ঔষধের শিশির ছিপিগুলি প্রস্তুত করার জন্য ঐ সকল কাগজ ব্যবহৃত হইত। এই দুই কাজ সম্পন্ন করিবার পর অবশিষ্ট যে সকল কাগজ থাকিত, তাহাও তিনি যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিতেন। কোন সেবক যদি কখনও আবর্জ্জনা বোধে উহা ফেলিয়া দিতে চাহিতেন, তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিতেন, "ক্ষমা করুন, আপনি কি ঐগুলি ক্ষুদ্র বলিয়া ফেলিয়া দিতে চাহেন? যদি তাহাই হয় তবে

আমি বলিব আশ্রমের কোন কিছুকেই ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিবার অধিকার আপনার নাই। আর যদি ঐগুলি অপ্রয়োজনীয় ও আবর্জ্জনা বলিয়া বোধ হয়, তবে ঐগুলিকে আশ্রমে রাখিবার স্থানেরও অভাব নাই। কাজেই, ঐগুলিকে গুছাইয়া রাখিলেই আপনার মন হইতে আবর্জ্জনার ভয় দূর হইয়া যাইবে। ফেলিয়া দিতে বাধা এই জন্য দেই, যে অনাবশ্যক বলিয়া কোন দ্রব্য এ জগতে নাই। আর সকলেরই এই কথাটুকু মনে রাখিলে ভাল হয়, 'যে যাকে রাখে, সে তাকে রাখে'। একদিন না একদিন এই সামান্য কাগজের টুক্‌রাও কোন বড় কাজে লাগিয়া যাইতে পারে।" সেবকটি হয়ত একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন, কেননা এত দূর ভবিষ্যতের কোন কাজের কল্পনা তাঁহার মনে না আসাই স্বাভাবিক। অতটা দূরদৃষ্টি সাধারণতঃ আশা করা যায় না। যাহা হউক, তিনি চারুবাবুর প্রতি শ্রদ্ধায় নীরব হইয়া রহিলেন। ক্রমে ঐরূপে সঞ্চিত হইতে হইতে ঐ ছিন্ন কাগজগুলি একস্থানে স্তূপাকারে পরিণত হইয়াছিল। গত মহাযুদ্ধের সময় যখন ঐ প্রকার ছিন্ন কাগজের মূল্য অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তখন আশ্রম হইতে ঐ কাগজগুলি বিক্রয় করায় প্রায় ৬৫৲ পঁয়ষট্টি টাকা পাওয়া গিয়াছিল।

এইরূপে চারুচন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্য্যরূপে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ঐরূপ খুঁটিনাটি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব-

প্রকার বৃহৎ কাজে এবং সামান্য তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্রমের সমস্ত দ্রব্যে এবং আশ্রম-মন্দিরে চারুচন্দ্রের জীবনব্যাপী তপস্যার অশেষ চিহ্ন এখনও যেন প্রতি বিষয়ে লিপ্ত রহিয়াছে।

এই আজীবন তাপসের তপস্যাময় জীবন তাঁহার চারি-পার্শ্বে তাঁহার সকল সঙ্গী ও বন্ধুদের উপর অমৃতময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহার কর্ম্ম, তাঁহার সরল বিশ্বাস, মধুর অমায়িক ব্যবহার এবং নিত্য সচেতন আনন্দ তাঁহাকে সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। সেই সময় যাঁহারা আশ্রম দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে মনে করিতেন যে, যেন কর্ম্ম, তপস্যা, ত্যাগ ও আনন্দের একটি স্বর্গীয় জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল এক দিব্য ভূমিতে তাঁহারা আসিয়াছেন। সত্য সত্যই কর্ম্মের মন্দাকিনীধারা, আনন্দের উৎফুল্ল তরঙ্গ এবং ত্যাগের শ্বাশ্বত বাণী যেন সেখানে অহর্নিশ জাগিয়া রহিত। তৎকালে সেবাশ্রম দর্শন করিয়া মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় তাঁহার "দেবগীতি" নামক পুস্তিকায় যে কবিতাটি সেবাশ্রম-সেবকগণের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, তাহা এই ভাবের এবং এই চিত্রের একখানি অপূর্ব্ব ছবি হইয়া রহিয়াছে। সেই সুন্দর কবিতাটি পাঠ করিলে, পাঠক উহাতে সেই সময়ের আশ্রম এবং আশ্রম-কর্ম্মীদের ও চারুচন্দ্রের প্রভাবের প্রস্ফুট পরিচয় পাইবেন। কবিতাটি এই :—

৺কাশী-রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের সেবকগণের প্রতি ।

(১)

কাশীধাম পুণ্যক্ষেত্র ব্রহ্মচারিগণ !
কে তোমরা দেহ পরিচয়,
পরিহরি ধ্যান, জপ, দেবতা দর্শন,
কি কাজে করিছ কাল ক্ষয় ;
গৈরিক বসন পরি, ভিক্ষান্নে জীবন ধরি
ভোগ তৃষ্ণা করেছ বর্জ্জন,
কেন তবে নাহি কর—দেবতা অর্চ্চন

(২)

বিশ্বনাথ সাক্ষাৎ আছেন কাশীধামে,
যে ভজে সে পায় মুক্তিধন ;
ভবের বন্ধন খসে—যাঁর পুণ্য নামে,
তায় উদাসীন কি কারণ ?
বুঝিতে নারিনু ভাব, বোঝ না কি লাভালাভ,
ভক্তি মুক্তি চাহ না কি ভাই ?
অদ্ভুত রহস্য, তাই পরিচয় চাই !

(৩)

পুনঃ কে এ চারুমূর্ত্তি তোমাদের মাঝে ?
নহে ত গৈরিক বস্ত্রধারী,
ব্রহ্মচারী সনে কেন সংসারীর সাজে,
মর্ম্ম কিছু বুঝিতে না পারি ।

সংশয় করিয়া নাশ, পূর্ণ কর অভিলাষ,
তোমা সবে এই নিবেদন,
বিস্ময়-তরঙ্গে মম আন্দোলিত মন।

(৪)

বুঝেছি বুঝেছি হায় বুঝেছি সম্প্রতি,
কে তোমরা নর-নারায়ণ,
জরাজীর্ণ মুমূর্ষুর হরিতে দুর্গতি
সেবাধর্ম্ম করেছ গ্রহণ ;
ভক্তি মুক্তি নাহি চাও, বিপন্নে যথায় পাও,
বক্ষে করি আনি সযতনে,
সেবাশ্রমে সেবা কর, অতি সন্তর্পণে।

(৫)

পরহিতে সর্ব্বস্বার্থ করি বলিদান,
সেবাব্রত করেছ গ্রহণ,
নিয়ত সাধিতে যত্ন পরের কল্যাণ,
জপ তপ সব বিসর্জ্জন।
শাস্ত্রে আছে উপদেশ, সর্ব্বঘটে পরমেশ
কিন্তু, হায় বুঝে কয় জন ?
অনুভব বিনা, মাত্র মুখের বচন।

(৬)

সর্ব্বঘটে নারায়ণ না হলে দর্শন,
হেন সেবা কে করিতে পারে ?
সংক্রামক রোগী, বৈদ্য করে না স্পর্শন,
তুমি যত্নে সেবা কর তারে।

মলমূত্র-মাখা কায়, অচেতন মৃতপ্রায়,
দুর্গন্ধে নিকটে কেবা যায় ?
কুড়াইয়া আনি, ব্যস্ত তার শুশ্রূষায়।

(৭)

কাশীবাসী দরিদ্র, গৃহস্থ অর্থহীন,
পীড়িত কে আছে কোন্‌খানে,
ঘরে ঘরে তত্ত্ব ল'য়ে ফের প্রতিদিন,
বাঁচাও ঔষধ-পথ্য দানে।
যেভাবে বিপন্ন যেবা, সাহায্য বা চায় সেবা
বিমুখ তাহে না কভু—হায়,
হেন স্নেহ কেবা কোথা দেখেছে ধরায় !

(৮)

কেহ বলে মাতার সমান স্নেহ নাই,
মাতৃস্নেহ অতুল এ ভবে,
সন্তানের প্রতি বটে দেখিবারে পাই,
অন্যে কি তা কখন সম্ভবে ?
নিজ পুত্রে যে যতন, করে মাতা অনুক্ষণ,
পরপুত্রে না হয় তেমন,
তাই বলি মাতৃ-স্নেহ স্বভাব বন্ধন।

(৯)

আত্মার স্বাধীনভাব প্রেম নাম তার,
আত্মপর থাকে না বিচার,
জাতি-নির্ব্বিশেষে খোলা সে প্রেম-ভাণ্ডার,
প্রবেশে সবার অধিকার।

ঘৃণা ভয় পরিহরি, এই প্রেম হৃদে ধরি,
অকাতরে বিলাও ধরায়,
স্বার্থপর নর ব্যস্ত নিজের চিন্তায়।

(১০)

এ হেন পবিত্র প্রেম রস আস্বাদন,
এ জীবনে ঘটিল না হায়!
বৃদ্ধের অবশ তনু, দুর্ব্বল জীবন,
অনুদিন জরাগ্রস্ত তায়।
পর-সেবা কেবা ক'রে, ব্যস্ত নিজ সেবা তরে,
কর্ম্মফল যাহার যেমন,
তাই বলি ধন্য হে তোমরা মহাজন!

(১১)

সেবাশ্রমে সেবাকার্য্যে যে আছ যেখানে,
সবাকারে করি নমস্কার,
বিপন্নে করিছ রক্ষা, বিবিধ বিধানে,
দেবপূজ্য প্রেম অবতার।
পরহিত-ব্রত ধরি, অবনীতে অবতরি,
পবিত্র করিলে ধরাধাম।
নিলে নাম স্বার্থ যায়, পূর্ণ হয় কাম॥

পুরুষ বিভাগের একাংশের দৃশ্য

দশম অধ্যায়।

কেবল যে কাজের নিয়ম গঠন এবং কার্য্যের প্রণালীকে সচল রাখাই তাঁহার কাজ ছিল, তা নয়। চারুচন্দ্র হৃদয়ে ছিলেন শিশুর মত আনন্দময়। আশ্রমের ভিতরে যাঁহাকে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ বলিয়া বোধ হইত, আশ্রমের বাহিরে প্রকৃতির মুক্ত বাতাসে তাঁহাকেই আপন-ভোলা একটি অপূর্ব্ব মানুষ বলিয়া মনে হইত। তিনি যে কেবল আপন আনন্দে আপনিই মগ্ন থাকিতেন, তাহা নয়, আশ্রমেও যেমন সকলকে লইয়াই তাঁহার কাজ এবং সকলের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিবার জন্য তাঁহার ঔৎসুক্য, তেমনই বাহিরেও তাঁহার আনন্দের সফলতা ছিল সকলকে লইয়া। প্রতিদিনই অপরাহ্নে আশ্রমের দৈনিক কার্য্য শেষে সেবকগণকে লইয়া তিনি কোন দিন বা নিকটবর্ত্তী, কোন দিন বা দূরবর্ত্তী, কোন বাগানে বা ৺গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাইতেন এবং সেই সমস্ত স্থলে বসিয়া সদালাপে হাস্য-আমোদে এবং নানারূপ প্রীতিপ্রদ খোস্-গল্পে সঙ্গিগণের অশেষ প্রীতি উৎপাদন করিতেন। কোন দিন বা নিজ ব্যয়ে ফলমূলাদি ক্রয় করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। আবার কখনও বা

নির্ম্মল আকাশের তলে ক্ষুদ্র একটি সভা করিয়া স্বামীজীর স্মৃতি-কথা কহিয়া এবং তাঁহার বাণীর চমৎকার সুগভীর ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে উৎসাহিত এবং স্তম্ভিত করিতেন। আশ্রমের সেবকগণ সকলে এককালে কর্ম্ম ফেলিয়া যাইতে পারিতেন না, এইজন্য তিনি ভ্রমণে যাইবার জন্য পালা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল লইয়া পালাক্রমে তিনি এক এক দিন বাহিরের অমল উৎসবে সকলকে যোগদানে উৎফুল্ল করিতেন। অতি কঠোর কর্ম্ম এইরূপে সেবকদের কাছে যেন সরস আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিত এবং কর্ম্ম করিবার শক্তিও তাহাদের মধ্যে নূতন হইয়া আসিত।

দৈনন্দিন ঐরূপ সরস আমোদ ছাড়া বৎসরে আরও কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি সেবকদিগের আমোদ-আহ্লাদের বৃহত্তর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেন। প্রতিবৎসরে মহাষ্টমী ও শিব-চতুর্দ্দশী দিনে তিনি তাপসের ন্যায় সকলকে লইয়া দেব-দেবী দর্শনে বাহির হইতেন। এই দুই দিবস তিনি নিরম্বু উপবাস করিতেন। শিব-চতুর্দ্দশী ব্রত-উপবাস তিনি সকলকেই করিতে বলিতেন; নিতান্ত অক্ষম হইলে প্রথম প্রহরের পূজান্তে ফল-মূল ও দুগ্ধ পান করিতে বলিতেন। তা' ছাড়া প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার পর দিবস "বসন্তে ভ্রমণং কুর্য্যাৎ" কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সফল করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাসকাশী, রামনগর প্রভৃতি স্থানে সদলবলে পরিভ্রমণে যাইতেন এবং শ্রাবণ

মাসের কোনও দিবসে সারনাথ প্রভৃতি স্থানে ঐরূপে ভ্রমণোৎসবে বাহির হইতেন। এই সব বিশেষ বিশেষ দিনের ভ্রমণের সময় আশ্রমে এমন ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন যে, মাত্র কয়েকজন সেবক আশ্রমের কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতেন এবং অধিকাংশ কর্ম্মী সে সময়ে বাহিরে চলিয়া যাইতেন। অথচ কোন দিন এজন্য কোন অসুবিধা তো হয়ই নাই, বরং এইরূপ ব্যবস্থায় সেবকদের কার্য্য করিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যাইত।

আশ্রম হইতে যখন তিনি ঐরূপ ভ্রমণে বাহির হইতেন, তখন আহার্য্যের জন্য চাল ডাল প্রভৃতি সঙ্গে লওয়া হইত। তাহা ছাড়া চারুবাবু নিজের ব্যয়ে সামান্য কিছু মিষ্টান্ন, ও মুড়ি প্রভৃতি ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, পথের শ্রমে কাহারও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইলে, তখন ঐগুলির দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি ও আনন্দবর্দ্ধন হইবে।

তাঁহার এই ভ্রমণের মধ্যে আরও একটি চমৎকার জিনিষ ছিল—শৃঙ্খলা, কষ্ট সহিবার আকাঙ্ক্ষা এবং সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকুশলতা লাভের উপায় করা। প্রত্যূষে পদব্রজে আশ্রম হইতে রওয়ানা হইয়া সেবকদল নানা খোসগল্প প্রভৃতি আমোদ-আহ্লাদ করিতে করিতে গন্তব্য স্থলাভিমুখে চলিতেন। হঠাৎ হয়ত কোথাও সোজা রাস্তা ছাড়িয়া খানিকটা কুসুমমণ্ডিত ক্ষেত্র বা কর্ষিত জমির

উপর দিয়া চলিয়া আসিতেন। এইরূপে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া দেবালয়ের সম্মুখে গিয়া বসিতেন এবং নিজেদের সহিত যে আহার্য্য আসিয়াছে তাহাই লইয়া রান্নার বন্দোবস্ত করিতেন। তখন কেহ বৃক্ষ হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ, কেহ বা মাঠ হইতে ঘুঁটে প্রভৃতি সত্বর লইয়া আসিতে লাগিলেন এবং তাহাতেই সকলে অশেষ আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তাহার পর রান্না ইত্যাদি আরম্ভ হইত। রান্নার শেষে স্নানাদি সমাপনান্তে দেবতা-দর্শন, স্তব-পাঠ ইত্যাদি যাবতীয় নিয়ম অনুষ্ঠানের পর, সেই পক্কান্ন দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া, সকলে জয়োল্লাসে প্রসাদ ভক্ষণ করিতেন এবং তৎপরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিয়া, দলে দলে বিভক্ত হইয়া, কোন দলে পাঠ-পাঠনাদি, কোন দলে বা বিভিন্ন কথা-প্রসঙ্গ, আর কোন দলে বা সুমধুর সঙ্গীতের চর্চ্চা চলিত। এইরূপে নানা অবস্থার মধ্য দিয়া আমোদ-আহ্লাদে মাখামাখি করিয়া লইয়া বিভিন্ন স্থান ও দেবতাদি দর্শন করিতে করিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আবার আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এই ভাবে বিশেষ ভ্রমণের দিনগুলি সেবকদিগের জীবনে কোথাও যেন সৈনিকের দৃঢ়তায়, কষ্টসহিষ্ণুতায়, গৃহস্থের কর্ম্মপটুতায়, গরীবের শ্রম-তৎপরতায়, ভক্তের ভক্তিতে এবং যুবজনের আমোদ-আহ্লাদে ভরিয়া উঠিত।

দেবদেবীর প্রতি চারুবাবুর একটা স্বাভাবিক ও প্রগাঢ়

ভক্তি ছিল। দেবতা দর্শনে এবং মন্দির প্রদক্ষিণে তাঁহার অপূর্ব্ব নিষ্ঠা লক্ষিত হইত। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, ইহার দ্বারা শুধু দেহের নয়, হৃদয় ও আত্মার উন্নত ভাবের সংস্রব অতিমাত্রায় সংসাধিত হয়। দর্শন, বিজ্ঞান, ভক্তি, সদাচার ও এইগুলির মধুর সমবায় এইরূপ জিনিষের মধ্যে সুন্দরভাবে রহিয়াছে এবং তদুপরি আত্মশক্তি বিকাশের একটি বিশেষ সাধনাও ইহারই মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া বহিয়া আসিতেছে। এজন্য তিনি প্রায়ই সেবকদিগকে সঙ্গে লইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেবতা দর্শনে গমন করিতেন। কখন কখন বা কর্ম্মিগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গাতটে গিয়া উপবেশন করিতেন এবং এই সমস্ত সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর ধ্যানের ব্যাখ্যা এবং তাঁহাদের চরিত-কথা ও কাশীধামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ইতিহাস শুনাইতেন এবং এই সমস্ত স্থান অতিক্রম করিতে করিতে যেখানে যে সাধু মহাপুরুষের স্মৃতি জড়িত আছে, সেইখানে তাঁহাদের পবিত্র জীবন-কথা সকলকে শুনাইয়া আনন্দিত হইতেন এবং সকলকেই আনন্দ দান করিতেন। সেবার কথা বলিতে বলিতে তিনি আত্মহারা হইতেন এবং যেন উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিতেন। তাঁহাকে দেখিলে তখন মনে হইত, যেন কথা বলিতে বলিতে সম্মুখবর্ত্তী কোন এক সেবা-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন। —"যে ব্যক্তি অধঃপতিত, পাপী, তাপী, দরিদ্রের এবং পতঙ্গ হইতে সামান্য কীটানুকীটের পর্য্যন্ত প্রাণ ভরিয়া সেবা

করিতে পারে, শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিতে হইলে তাহারই মধ্যে করিয়া থাকেন। মানুষের যদি সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিবার সৌভাগ্য হয়, তবে পরম কর্ত্তব্যরূপে, পরম ধর্ম্মরূপে নর-নারায়ণের সেবায়—পৃথিবীর যাবতীয় জীবের সেবায়, আপনা ভুলিয়া আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। নিজেকে একটুও রাখিয়া চলিলে চলিবে না। অপরের কল্যাণের জন্য যদি নিজেকে নরকে যাইতেও হয়, সহাস্য-বদনে তাহাও করিতে হইবে। মানবের চিরকাম্য যে মুক্তি, সে মুক্তি আর কোথাও নয়. মুক্তি বলিয়া অন্য কোন জিনিষের সত্তা নাই। সমস্ত জীবের মধ্যে আত্মপ্রসারই প্রকৃত মুক্তি এবং তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমামুক্তি। মানুষ নিজের কথা ভাবিয়া যে ক্ষণটুকু কাটায়, সেই টুকুই তার বন্ধনের কাল। বৃথা সেই বন্ধন সজোরে ছিন্ন করিয়া দিয়া কেন সে এই পরমা মুক্তিকে চায় না? মানুষ যখনই আপন চিন্তা করে, তখনই সে চিন্তা তাহাকে নানারূপে অস্থির করিয়া ক্ষিপ্ত করিয়া তুলে। তাই, নিজের বিষয় চিন্তা না করাই ভাল! যখন মানুষ পরের চিন্তাকে হৃদয়ের কমলাসনে স্থান দেয়, তখন সেই চিন্তাই সত্য সত্যই পরম চিন্তা। তখন পরের জন্য—যেমন প্রাণের ব্যাকুলতা, যেমন কর্ত্তব্যকর্ম্মের দায়িত্বজ্ঞান, যেমন প্রাণঢালা শক্তি এবং মনের উৎসাহ, দশদিক হইতে ফুটিয়া আসে, সেই আনন্দময় উৎসাহের কাছে নিজের চিন্তার অবসাদ ভস্মরাশির মত একান্ত উপেক্ষণীয়। নিজের

মুক্তি এ ছাইয়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় ঐ অমৃতের মধ্যে। এইজন্য আপন মুক্তির চিন্তা বা কল্পনার ভস্ম, পরের হিত-চিন্তার গঙ্গা প্রবাহে নিক্ষেপ করিয়া মুক্ত হওয়াই মুক্তি। নিজের জন্য চিন্তা—কীট হইতে পশু-পক্ষীরা সকলেই করিতেছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ যদি তাহা অপেক্ষা উচ্চে না গেল, তবে কোথায় মনুষ্য-জন্মের সার্থকতা! মানুষের প্রকৃত হিত আপনাকে লইয়া নহে—পরকে লইয়া। অপরের হিত সাধন করিলেই মানুষের যথার্থ মঙ্গল হয়। যেখানে দেহের অতিরিক্ত মন এবং মনের অতিরিক্ত আত্মা এই জ্ঞানটি আসিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, সেখানে পরের মধ্য দিয়া আত্মার উপলব্ধিই প্রকৃত উপলব্ধি এবং যথার্থ শুভ। এইজন্য নিজেকে ফেলিয়া দিতে ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন কারণ নাই। নিজেকে বিলাইয়া দিতে পারিলেই মানুষের প্রকৃত আনন্দ এবং প্রকৃত সার্থকতা। নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া অপরের সেবায় যে মানুষ পাগল, সেই মানুষই প্রকৃত মানুষ। যদি জগতে জীবনের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল কেহ কামনা করে,—সেবাই সেই মঙ্গলের মূল মন্ত্র। সাধু ও জ্ঞানিজন অপরের জন্যই চিরকাল জীবন উৎসর্গ করিয়া আসিয়াছেন। জীবনে তাঁহাদের চাহিবার যদি কিছু থাকে, তবে আপনাকে দেওয়াই তাঁহাদের চাওয়া। আত্মদান করিয়া জগতে যাঁহারা সত্যকে পাইয়াছেন—শুভকে পাইয়াছেন,—সুন্দরকে ও আনন্দকে পাইয়াছেন,—তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে মানব-জীবনের আদর্শ ধরায় রাখিয়া গিয়াছেন।”

পূজ্যপাদ আচার্য্য স্বামীজীর ইহাই ছিল শিক্ষা এবং ইহাই ছিল তাঁহার কর্ম্মযোগের আদর্শ। এই আদর্শই চারুচন্দ্রের জীবনে এবং সেবাব্রতে অনিন্দ্যসুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

যাহাদের এমন সৌভাগ্য হয় নাই যে, স্বামীজীর পদতলে বসিয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী শুনিয়াছেন, সেই সকল তরুণ কর্ম্মীদের হৃদয়ে সেই সকল কথার জ্বালাময়ী উদ্দীপনা তিনি নিত্য জাগাইতেন। চারুচন্দ্র সমস্ত বন্ধুজন লইয়া এইরূপে সেবাব্রতে পাগল হইয়াছিলেন এবং চারিদিকে পাগল ব্রতিদল প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছিলেন। যে তাঁহার সংস্রবে আসিত, কি কর্ম্মী, কি অলস, সকলেই এই সেবার অমৃতের আস্বাদে পাগল হইয়া উঠিত।

এই সেবা-পাগল কর্ম্মিদলের দৈনন্দিন কার্য্যের প্রভাবে যেমন করিয়া নৃত্য-পাগল মহাদেবের নৃত্যাবেগে মন্দাকিনী বহিয়া গিয়াছিল, তেমনই করিয়া সেবকদের হৃদয়ে কর্ম্ম ও আনন্দের গঙ্গা এবং অশ্রুর মন্দাকিনী শত শত ব্যথিতের দুঃখ-মুক্তির প্রবাহিনীরূপে আনন্দময়ের পুণ্যক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

একাদশ অধ্যায়।

এইরূপে দেখিতে দেখিতে সেবাশ্রমের দীর্ঘ একাদশ বর্ষ বহু শ্রম ও বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা এবং বহু আনন্দের স্মৃতি সঞ্চিত করিয়া অতিবাহিত হইল। এই দীর্ঘকাল শরীরে, মনে, প্রাণে এবং আত্মায় কর্ম্মিগণ বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু এখনও অনেক বাকি। যেমন কোন গৃহ-ভিত্তিমূলে খনিত মৃত্তিকার তলে একের পর একে ইষ্টকগুলি লোক-চক্ষুর অগোচরে আপনাদিগকে প্রোথিত করিয়া দিয়া মন্দির নির্ম্মাণের ভিত্তি প্রস্তুত করে, তেমনই করিয়া যামিনীরঞ্জন হইতে চারুচন্দ্র, চারুচন্দ্র হইতে কেদারনাথ এবং সঙ্ঘের প্রথম সেবকগণ ও বন্ধুবর্গ এবং তাঁহাদিগের হইতে পরবর্ত্তী কর্ম্মিদল এবং তাঁহাদের পরে তরুণসেবকগণ নরনারায়ণ সেবার পবিত্র মন্দিরের ভিত্তিটি যুগকালব্যাপী সাধনায় গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহারা মানস-নেত্রে দেখিতে পাইলেন, আজিকার সাধনা ও আশার রাগরঞ্জিত সন্ধ্যার—ও সম্মুখে নূতন যুগের ভবিষ্যতের আশাময় দিব্যালোকের মাঝখানে এক সুদীর্ঘ রজনী পড়িয়া আছে। তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, এই দীর্ঘকাল নিরন্তর সেবাদ্বারাও সকল দুঃখীর অভাব, সকল বিপন্নের প্রয়োজনের এক কণাও মিটাইতে তাঁহারা পারেন নাই। তাঁহারা দেখিলেন, অগণিত দুঃস্থ ব্যক্তি নিত্য

অসহ্য দুঃখ-জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া অবারিত ভাবে মরণের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আর ঐ সকল দুঃস্থ, রুগ্ন, বিপন্ন, গৃহহীন, অনশন-ক্লিষ্ট, নিঃসহায়, অক্ষম ও বার্দ্ধক্যপীড়িত ব্যক্তিগণের হাহাকারে দিগ্‌দিগন্ত কম্পিত হইতেছে। বোধ হয়, বিশ্বেশ্বর মানব-হৃদয়ে জীবপ্রীতির পদ্ম-কলিকা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য সহানুভূতির এমন নির্ম্মল পুণ্য সরোবরেও দুঃখের কর্দ্দম রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি মানুষকেও এই কর্দ্দমরূপ কুঙ্কুম-পঙ্ক-লিপ্ত হৃদয়-পদ্মে নিজের আসন দৃঢ় করিয়া বসাইবার জন্য এমন সুন্দর সুযোগ আনিয়া দিয়াছেন। যাহারা দুঃখ পায়, তাহারা বুঝি আপনিই নারায়ণ। আপন সারা অঙ্গে দুঃখ লেপিয়া মানুষকে টানিয়া কোলে লইয়া, সত্য সত্যই মানুষ যে, তার মানবত্বের পরিপূর্ণতা এবং তার মুক্তির আনন্দ, তার গম্য পথের ধূলার উপরেই কুসুমাস্তরণরূপে বিস্তৃত করিয়া রাখিয়াছে। এ সত্য যে বুঝিল না—তার হৃদয়-দুয়ার বৃথাই বন্ধ রহিয়া গেল। আর যে বুঝিল, তার জীবন সেই ধূলা হইতেই শালগ্রাম কুড়াইয়া লইয়া সেই অক্ষয় তৃপ্তিলাভে চিরধন্য হইয়া গেল। সেই তৃপ্তিরূপ মণির জন্য মণিহারা ফণীর ন্যায় সেবকগণ যখন উন্মত্তপ্রাণ লইয়া কাশীর গলিতে গলিতে দিবস-যামিনী অক্লান্তভাবে ঘুরিয়াছেন, তখন কত যে নিদারুণ দৃশ্যে তাঁহাদের নয়ন গলিয়া গিয়াছে এবং কত যে করুণ ক্রন্দনে তাঁহাদের হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে দারুণ বেদনা ভোগ হইয়াছে, তাহা আর কে জানিবে! আজ মনুষ্যত্বের ও সভ্যতার

বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুঃখীর এই দুর্দ্দিনে এবং এই চরম অবস্থার প্রতিকারের জন্য দেশবাসীর প্রাণে যাহাতে তাঁহাদেরই মত ব্যথা লাগে, তাহারই জন্য তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের কাজও অতি ক্ষুদ্র, তাঁহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প। সমস্ত দেশের প্রাণে প্রাণে এই আগুনের প্রদীপ যদি জ্বলে, তবেই দেশের গভীর অন্ধকার দূর হইয়া গিয়া দুঃখীর হৃদয়ে আনন্দের দীপালোকে ভারতের সকল অধিবাসীর গৃহই আলোকময় হইয়া উঠিবে।

এই জন্য যত দূর তাঁহারা পারিয়াছেন বা তাঁহাদের সৌভাগ্যে করিতে পারিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহাদেরই মধ্যে একটি কেন্দ্রে আবদ্ধ না রাখিয়া যাহাতে তাহা সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতে পারে, সেজন্য তাঁহারা সম্ভবমত শাখা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং অচিরে সকলে এই নূতন উদ্যম সফল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এস বাঙ্গালী, এস ভারতবাসী, আজ সেবাশ্রমের এই নূতন কর্ম্মে—নূতন ব্রতে তোমাদের হৃদয়ের শুভ কামনা, তোমাদের নিত্যকর্ম্মের সঙ্গে আমাদের এই ক্ষুদ্র কার্য্যের সহিত যুক্ত হউক। এই সত্যের পতাকা তুলিয়া সেবকদল তাঁহাদের নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে দুঃসাহসে অবতীর্ণ হইলেন। এখানে তাঁহাদের অন্তরে লুক্কায়িত এই আশা রহিল যে, যেন ভারতে আর কোনরূপে কোন দুঃখী, কোন অভাবগ্রস্ত, কখনও নিঃসহায় না থাকে। বড় অসীম কার্য্য, বড়ই বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র, কিন্তু

মহৎ কর্ম্মের একটি কণাকেও যদি সমস্ত জীবন দিয়া স্পর্শ করা যায়—তাহাই কর্ম্ম-জীবনের গরীয়সী সিদ্ধি।

শ্রীবিশ্বনাথের ইচ্ছায় জনৈক মহানুভব ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহাদের এই সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য দানেও কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং তাঁহার এই প্রতিশ্রুতি নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে পালিত হইতে লাগিল। কে যে তাঁহাকে বল দিত—তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু তাঁহার কাছে সেবকেরা যাইবার পূর্ব্বেই তিনি আপনিই সেবকের মত এই নূতন সেবাধর্ম্মে আপনার প্রাণের অঞ্জলিটি আনিয়া অর্পণ করিতেন। এই পুণ্যবানের দানের সাহায্যে সেবকগণ ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে জঙ্গমবাড়ী মহল্লায় একটি বাটি ভাড়া লইয়া তাহাতে প্রায় ২০ জন অক্ষম—দুঃস্থ—বৃদ্ধবিধবার আশ্রয় প্রদানে সমর্থ হইলেন। অন্যান্য ব্যয় এবং তাঁহাদের অন্নবস্ত্র প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বস্তুর যাবতীয় অভাব—সেবকগণের অক্লান্ত চেষ্টায় ও নবীন কর্ম্মোদ্যমের বিপুল উৎসাহে এবং সহৃদয় নব নব দাতৃগণের প্রদত্ত অর্থে পূর্ণ হইতে লাগিল।

এমন করিয়া যে নূতন কেন্দ্রটি এরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়া উঠিবে এবং চারিদিক হইতে মহাপ্রাণ দাতৃগণের ভাণ্ডার এমন করিয়া উন্মুক্ত হইবে, তাহা কার্য্যারম্ভে কর্ম্মিদল আশা করিতে পারেন নাই। এইরূপ অচিন্তনীয় সাফল্যের প্রভাবে আশা-ভরসা এবং কর্ম্ম-সফলতা একত্রে মিলিয়া

সেবকগণের প্রাণে যেন নূতন বল আনিয়া দিল। তাঁহারা পরিপূর্ণ উদ্যমে এই নূতন কর্ম্মটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে এবং ইহার স্থায়িত্ব-সিদ্ধির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বেশীদিন অতীত হইল না, তাঁহাদের সেবা যেন আপনি কোথা হইতে নূতন নূতন সহায়তা ডাকিয়া আনিতে লাগিল। শাখা-আশ্রমটি একটু বর্দ্ধিত হইতেই আর একটি অপ্রত্যাশিত অমূল্য সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথায় যে কোন্ প্রাণ হইতে কর্ম্মের অমৃত ঢালিয়া দিতে উহা উন্মুখ ছিল, তাহা তাঁহারাও জানিতেন না। যিনি মহাপুণ্যধাম কাশীক্ষেত্রে এবং বহুদেশে বারাণসী-মাহাত্ম্য-কথা-পূর্ণ কাশীখণ্ডের প্রচারে দেশকে ধন্য করিয়াছেন, কাশীধামের প্রসিদ্ধ রুদ্রাক্ষ-বিক্রেতা সেই নিবারণচন্দ্র দাস মহাশয় জীবনের অপরাহ্লে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আপনার প্রায় সমস্ত সম্পত্তি এই আশ্রমে দান করিলেন। এই দানের পরিমাণ নিতান্ত কম নহে। উহা হইতে নিত্য আয়ের পথ যেমন ছিল, তেমনই দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকটস্থ একটি বাটী ছিল। এইটি ছিল তাঁহার নিজের বাসভবন। অসহায়া নারীগণকে সর্ব্বোপায়ে সাহায্য করাই ছিল তাঁহার দানের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ের কোন্ কোণে তাঁহার জীবনব্যাপী এই উদ্দেশ্য সুপ্ত ছিল, তাহার জাগরণের শুভমুহূর্ত্তে—এই আশ্রমের কথাটুকু শুনিয়া তিনি ইহা দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং তাহার পরেই তাঁহার সমস্ত

আজন্মসঞ্চিত অর্থ এই আশ্রম-কর্ম্মে তিনি সমর্পণ করিলেন। সেই দান ধন্য হইল, দাতা ধন্য হইলেন এবং সেবকগণও ধন্য হইলেন—পূজার এই মহান্ উপচার পাইয়া। তাঁহার দান আজও নিয়মিতভাবে ধন্য হইয়া চলিয়াছে;—চলিয়া তাঁহাকে সেবাব্রতিরূপে অমর করিয়া রাখিয়াছে। নিবারণচন্দ্র এইরূপে জীবনের সমস্ত পার্থিব ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিয়া নিবারণশূন্য অনন্ত আনন্দলোকে চলিয়া গিয়াছেন।

কাশীধামে মাতৃজাতির দুঃখ প্রাণে প্রাণে যিনি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাদের শেষ জীবনের অক্ষম দিনগুলির কথা যিনি নীরবে বসিয়া হৃদয়পটে লিখিয়াছিলেন, সেই পুণ্যাত্মার দান আজ হইতে নূতন করিয়া সফল হইতে চলিল। নূতন আশ্রম এইবারে জঙ্গমবাড়ীস্থিত গৃহ ত্যাগ করিয়া নিবারণচন্দ্র-প্রদত্ত দশাশ্বমেধের বাটীতে স্থায়িরূপে স্থাপিত হইল এবং এই পুণ্যগৃহ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের শাখা আশ্রমরূপে প্রতিষ্ঠিত এবং খ্যাত হইল। ১৮জন অথর্ব্ব বিধবার স্থায়ী বাসোপযোগী স্থান এখানে সুনির্দ্দিষ্ট হইল এবং এখন হইতে আরও বহুসংখ্যক অনাথা এখানে সাময়িক আশ্রয় লাভ করিয়া দুঃখ-কষ্টের শান্তি লাভ করিতে লাগিলেন।

এই আশ্রমের ব্যবস্থা এমন করা হইল যে, তাহা কি সেবকদের, কি আশ্রয়প্রাপ্তদের সকলেরই বিশেষ প্রীতির কারণ হইতে থাকিল। বর্ষীয়সী এবং বৃদ্ধা মহিলারা

এখানে আশ্রয় পাইবেন, এই ছিল উহার মূল উদ্দেশ্য। সেবকগণ মাতৃজাতির গৌরবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা করিলেন যে, কোন পুরুষই এই আশ্রমে বাস করিতে পারিবে না। কেবলমাত্র বর্ষীয়সী অনাথা ও অথর্ব্ব বিধবাগণ এই আশ্রমের সর্ব্বময়ী হইয়া রহিলেন। এই বিধবাগণের মধ্যে যিনি কিছু পরিমাণে সমর্থা, তাঁহাদের কাহারও দ্বারা তথাকার ভাণ্ডার প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। আশ্রম হইতে সেবকগণ আসিয়া যখন যে কোনরূপ আবশ্যক হইবে, তাঁহাদের নির্দ্দেশমত সেই কার্য্য করিয়া দিয়া যাইবেন এবং সে সমুদয় তত্ত্বাবধানের শ্রমও তাঁহারাই করিয়া দিয়া যাইবেন। অথর্ব্ব এবং অক্ষম বিধবাগণের যত্নাদিও আবশ্যকমত সমর্থা বিধবাগণের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইবে। আশ্রমের রান্না এবং বাসনাদি মাজিবার জন্য, ব্রাহ্মণবংশীয়া পাচিকা এবং ঝি প্রভৃতি বেতন দ্বারা নিযুক্ত থাকিবে। পাচিকা একবেলা রান্না করিয়া দিয়া যাইবেন। রাত্রে বিধবাদের জলযোগের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ দ্বারা আবশ্যক দ্রব্য তত্ত্বাবধায়িকাই কিনিয়া দিবেন। বস্ত্রাদির অভাব যখন যাহা হইবে, তৎসমুদয় তত্ত্বাবধায়িকার পরামর্শ ও সামর্থ্য অনুসারে দূর করা হইবে। কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহাকে প্রধানাশ্রমে লইয়া গিয়া চিকিৎসা প্রভৃতি সেবা-যত্নের বন্দোবস্ত করা হইবে। এইরূপে বৃদ্ধা, অনাথা ও অথর্ব্ব মাতৃজাতির অক্ষমতার

দিনগুলি কাটাইবার সুব্যবস্থা করা হইল। এইরূপে এই নবীন আশ্রমের দ্বারা মানবের কর্ত্তব্য-ধর্ম্মের, দাতার দান-ধর্ম্মের, কর্ম্মীর সেবা-ধর্ম্মের এবং সেবাশ্রমের বিশেষ অনুষ্ঠান বারাণসী-ক্ষেত্রে সুশৃঙ্খলভাবে প্রসারিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

কর্ম্মক্ষেত্র নিত্য কর্ম্মপ্রবাহের স্রোতে বিস্তৃত হইয়া চলিতেছিল। কাজের পর কাজ বাড়িয়া চলিতেছে। জনসাধারণের পরিপূর্ণ সহানুভূতি পাইয়া কর্ম্মের পরিসর ক্রমেই কাশীক্ষেত্রময় ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গৃহ কতকগুলি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য দান করিয়াছিলেন—তাঁহাদের কতকের সাহায্য কিছু বিলম্বে হস্তগত হয়। এজন্য ঐ অর্থ পাওয়াতেও তাহা বর্ত্তমান জমিতে গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে নাই। যাঁহাদের অর্থ পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল, তদ্দ্বারাই অনুষ্ঠিত গৃহগুলি নির্ম্মিত হওয়ায় আশ্রমভূমির নির্দ্দিষ্ট স্থান সকল পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঐ সকল গৃহ দ্বারা গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি পূর্ণ হইয়া গেলেও সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের নিমিত্ত আরও গৃহের প্রয়োজন ছিল। বিসূচিকা, রক্তামাশয়, প্লেগ, ক্ষয়প্রভৃতি রোগে পীড়িতদের জন্য আবশ্যক ও অভিলাষানুরূপ পৃথক্ গৃহ নির্ম্মাণ করা হয় নাই। আবশ্যকতা থাকিলেও ক্রীত জমিতে আর যথেষ্ট স্থান ছিল না। এজন্য আশ্রম-সংলগ্ন আরও যে কিছু মুক্ত জমি পার্শ্বে ছিল, সেই ভূমি ক্রয় করিবার জন্য সেবকগণ আগ্রহের সহিত

চেষ্টা করিতেছিলেন। উহা পাইলে অতঃপর আশ্রমের কার্য্য-ক্ষেত্রের প্রসার এবং বর্ত্তমানের অভাব পূরণ হইতে পারে। কিন্তু, সেই জমি স্থানীয় জমিদারগণ বিক্রয় করিতে অনিচ্ছুক থাকায়, উহা পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। আশ্রম-কর্ম্মিগণ ও সর্ব্বসাধারণ হয়ত আশা করিতেছিলেন যে, একদিন না একদিন ঐ জমিদারদিগের হৃদয় আর্ত্তদের দুঃখনিবারণের জন্য অবশ্য দ্রবীভূত হইবে। এই ভাবেই সেবকগণ ধৈর্য্যের সহিত শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া সর্ব্বপ্রকার রোগীদিগের এবং সংক্রামক রোগীদিগের জন্য একই আশ্রমে কোনরূপে ব্যবস্থা করিয়া, যতদূর সম্ভব, রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া সমস্ত রোগীদিগকেই সেবাযত্ন করিতে লাগিলেন।

দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। অনেক প্রকার চেষ্টাতেও উক্ত জমিদারগণের মন আর্দ্র হইল না। সেবকগণ সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদিগের পৃথক্ স্থানের ব্যবস্থা বিষয়ে অতিশয় চিন্তান্বিত ভাবে দিন কাটাইতে ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের অভিলাষানুরূপ স্বচ্ছন্দ স্থান এখনও হইয়া উঠিল না।

রাত্রি ভোর হইয়াছে। আশ্রমে পাখীর কাকলি গান এবং আনন্দবন কাশীক্ষেত্রের দেবমন্দিরগুলি হইতে উত্থিত প্রভাত-আরতির সুমধুর বাদ্যধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেবকগণ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন। এমন সময় একটি সুদর্শন বিদেশী আশ্রম-দ্বারে আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি আর

কেহ নহেন—বারাণসীর কালেক্টর বাহাদুর মিষ্টার ষ্টেট্ফিল্ড্। চিনিতে পারিয়া আশ্রম-অধ্যক্ষ এবং দুই একজন কর্ম্মী তাঁহাকে আশ্রম দেখাইতে লাগিলেন। আশ্রমের স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় সংক্রামক রোগীদিগকে পথ-ঘাট হইতে তুলিয়া আনিয়া অপরাপর রোগীদিগের নিকটবর্ত্তী গৃহে রাখা হয়, তাহাও দেখাইলেন এবং আশ্রম-সংলগ্ন পাঁচ ছয় বিঘা ভূমি সংক্রামক রোগীদিগের বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণার্থে স্থানীয় জমিদারগণের নিকট হইতে ক্রয় করিবার জন্য পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিয়াও বিফলমনোরথ হইয়াছেন ; তাহাও বলিলেন। তৎপর তাঁহাকে আফিষ গৃহের ছাদে লইয়া গিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সব জমিগুলিও দেখান হইল। কালেক্টর বাহাদুর ঐ সকল দেখিয়া এবং শুনিয়া বলিলেন যে, আপনারা সাধারণের পরম হিতার্থে কার্য্য করিতেছেন—ইহা সম্পূর্ণ সাধারণের কাজ ; সেই হেতু ল্যাণ্ড্ অ্যাকুজিসনে আপনারা জমি লইতে পারেন। আপনারা দরখাস্ত করুন, আমি সাধ্যমত আপনাদিগকে সাহায্য করিব। শুধু পাঁচ ছয় বিঘা জমি কেন? এই বিস্তৃত সমস্ত জমিগুলির জন্যই দরখাস্ত করুন। তিনি আরও বলিলেন যে, আমিও মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান্‌রূপে সাধারণের একটি পায়খানার জন্য জমিদারগণের নিকট কিছু জমি ক্রয় করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলাম—কিন্তু, তাঁহারা তাহাতে সম্মত হন নাই। অতএব আপনারা ল্যাণ্ড্ অ্যাকুজিসনে জমি পাইলে

তাহা হইতে ঐ কার্য্যের জন্য মিউনিসিপ্যালিটীকে উহার দক্ষিণাংশের খানিকটা জমি দিতে হইবে। মিউনিসিপ্যালিটী তাহার মূল্য দিবে। কালেক্টর বাহাদুর আবার বলিতে লাগিলেন, আমি আপনাদের কার্য্যের কথা শুনিয়াছিলাম এবং আজও আপনাদিগের মহানুভাবতা ও স্বার্থত্যাগপূর্ণ কার্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। পরোপকার সাধন উদ্দেশ্যে সাধারণের জন্য আপনাদের এরূপ করিয়া আত্মনিয়োগ নিতান্ত প্রশংসনীয়। আপনারা সাধারণ তহবিল মিউনিসিপ্যাল ফণ্ড হইতে সাহায্য পাইয়া থাকেন ও আপনাদের সোসাইটি সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে স্থাপিত এবং আইন অনুসারে রেজেষ্টারী-কৃত। আপনাদের এইরূপ মহৎ কার্য্য সর্ব্বসাধারণের হিতার্থ, সুতরাং আপনারা পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত জমিই গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে ল্যাণ্ড্ অ্যাকুজিসন অ্যাক্ট অনুসারে উপযুক্ত মূল্য দিয়া আশ্রম-অন্তর্ভুক্ত করিতে পারেন।

চারুচন্দ্র প্রভৃতি কর্ম্মিগণ তখন তাঁহাকে ধন্যবাদ দ্বারা অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন এবং দুঃখীর দুঃখের কথা তাঁহার গোচর করাইয়া যাহাতে সহজে পার্শ্ববর্ত্তী জমি আশ্রম-অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, তাহার বিধানের জন্য তাঁহার সদুপদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থাতে উদ্যোগী হইতে সম্মত হইলেন।

সেই সময় মিশনের সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার

প্রেরণায় চারুচন্দ্র নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া ঐ কার্য্যের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। শ্রীমহারাজের আদেশে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ল্যাণ্ড্ অ্যাকুজিসনে জমি সংগ্রহ করাই স্থির হইল এবং অচিরেই তজ্জন্য দরখাস্ত করা হইল। ইহা ১৯১২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগের কথা।

ঐকালে আশ্রম, সর্ব্বসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কার্য্যতঃ যে যোগসূত্রের সৃষ্টি হইল, ইহা অতিক্ষুদ্র হইলেও তৎকালে কর্ম্মীদিগের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কারণ হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

আরো দুইটি বৎসর সেবকগণের বিপুল আশা, বেদনা ও আনন্দের মধ্য দিয়া কাটিল। ১৯১৪ সালের এপ্রেল মাসে আশ্রম-সংলগ্ন প্রায় পঁচিশ বিঘা জমি গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে প্রায় ১৫০০০৲ পনের হাজার টাকায় ক্রয় করা হয়। এই নূতন বিস্তৃত স্থান সর্ব্বপ্রকার সংক্রামক রোগীদিগের জন্য (Segregation ward) পৃথক্ পৃথক্ গৃহসকল নির্ম্মাণের এবং অবৈতনিক চিকিৎসক ও সেবকগণের বাসোপযোগী বাটী নির্ম্মাণের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। যাহাতে উদ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হইতে অধিক বিলম্ব না হয়—আশ্রমের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র সমস্ত মনঃপ্রাণ ঢালিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আয়োজন ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল এবং মহৎ কার্য্যের আহ্বানে বিভিন্ন স্থান হইতে মহানুভাব ব্যক্তিগণের সহানুভূতি এবং সাহায্য নানা মূর্ত্তিতে আসিয়া পুঞ্জীকৃত হইতে লাগিল। সেবকগণ অনেক সময় আশ্চর্য্য বোধ করিতেন যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে এরূপ কাজ কি করিয়া সম্ভব হইল! তাঁহারা বুঝিলেন, যেমন আশ্চর্য্যভাবে কাজের আরম্ভ হইয়াছে—স্বয়ং বিশ্বনাথই তেমনি আশ্চর্য্য ভাবেই এই কর্ম্মের উদ্‌যাপন করিতেছেন এবং আরও করিবেন।

জমি আশ্রম-অন্তর্ভুক্ত হইবার প্রায় সপ্তাহকাল মধ্যে ২৯শে এপ্রেল ১৯১৪, তারিখে বারাণসীর কলেক্টর মিষ্টার

ষ্টেট্‌ফিল্ড্‌ সাহেব মহোদয় কর্ত্তৃক উক্ত জমিতে বহু সজ্জন ও উৎসুক জনসাধারণের আনন্দ-রোলের মধ্যে নূতন গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য ভিত্তি স্থাপিত হইল। তাহার পর হইতেই কার্য্যের আয়োজন পরিপূর্ণ বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেবকগণ এই নূতন ক্ষেত্রে বহু মহাপ্রাণ ব্যক্তির সবিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা পাইয়া অক্লান্ত যত্ন এবং পরিশ্রমে কার্য্য উদ্‌যাপনে ডুবিয়া গেলেন। ১৯১৬ সালের মধ্যেই অমর দাতৃগণের সাহায্যে উক্ত ভূমিতে পাঁচটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ওয়ার্ড বা বিভাগ প্রস্তুত হইয়া গেল।

আজ সেবকগণের মনে হইতে লাগিল—যাঁহার পূজা, তিনিই পূজা-উপচার এই অপূর্ব্ব অপ্রত্যাশিতভাবে বুঝি আনিয়া দিয়াছেন। অধ্যক্ষ চারুচন্দ্রের মনে কি হইতেছিল? তিনি ভাবিতেছিলেন—সেই অতীতের দিনে—সেই প্রত্যুষে যামিনীরঞ্জনের প্রার্থনালব্ধ এবং সেই অজ্ঞাতনামা মহাপ্রাণ পুরুষের প্রদত্ত দানের একটি মাত্র সিকি হইতে যে কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছিল—আজ সেই কার্য্য বিশ্বনাথের ইচ্ছায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে, তাহা লক্ষ মুদ্রা পার হইয়া দুই লক্ষকেও পার হইতে চলিতেছে। তাঁহার ইচ্ছাই সব; এবং যাঁহারা আতুর, যাঁহারা অক্ষম, তাঁহাদেরই কাতর নয়ন-জলের অন্তর্নিহিত বেদনারাশি এত দিন ধরিয়া জমাট বাঁধিয়া আজ তাঁহাদেরই জন্য তাঁহাদের এই অপূর্ব্ব আদরের জিনিষ গড়িয়া তুলিয়াছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দিনের পর দিন চলিতেছে। একের পর আর একজন সেবক আসিয়া সেবার গুরুভার বহন করিয়া চলিতেছেন। একের মুক্তহস্তের আদর্শে অপরের হৃদয়-কপাট খুলিয়া গিয়া সেবা-উপকরণ আসিয়া পৌঁছিতেছে। চারুচন্দ্রের বড়ই উল্লাস, বড়ই আনন্দ! কিন্তু তবুও তাঁহার মনের এক কোণে আজও কিসের অভাব,—যেন সেইজন্য তিনি প্রাণে ব্যথা অনুভব করিতেছেন।

চারুচন্দ্র চিন্তা করিতেছিলেন যে, আশ্রমের যে একটি শাখা অদূরে রহিয়াছে, তাহারই একটি অনুষ্ঠান এখানকার সন্নিকটে করিতে হইবে। মাতৃজাতির আশ্রয় এখানে যত-দিন না হয়, ততদিন আশ্রমের পূর্ণতা কোথায়?

আশ্রমে পুরুষ এবং বৃদ্ধা স্ত্রী লোকদিগকেই মাত্র সাহায্য করিতে পারা যাইত। কারণ, আশ্রমে মহিলা সেবিকার একান্ত অভাব ছিল। দুই একজন প্রৌঢ়া মহিলা কখনও সেবাব্রতে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহাতে আত্মনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক হইতেন এবং কেহ কেহ বা আত্মনিয়োগ করিতেন। তাঁহাদিগের দ্বারা অধিকসংখ্যক স্ত্রীলোকের সেবা সম্ভবপর হইত না। শাখা-আশ্রমে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা এত অসমর্থা যে, তাঁহাদিগকে এখানে আনাইয়া সেবা

করাইবার প্রশ্নই কাহারও মনে উদিত হইতে পারিত না। ইহা ছাড়া কোন অল্পবয়স্কা স্ত্রী-সেবিকা বা স্ত্রী-রোগিণীকে আশ্রমে গ্রহণ করা সম্ভব হইত না। খুব বিপন্না হইলে যদি কখনও গ্রহণ করা হইত, তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা কিন্তু, স্ত্রী-সেবিকার অভাবে অনেক সময়েই ইচ্ছানুরূপ ঘটিয়া উঠিত না। এই সমস্ত কারণে আশ্রমের এই বিভাগ এক রকম খর্ব্ব হইয়াই ছিল এবং মনে ইচ্ছা থাকিলেও এদিকে দৃষ্টি দিবার সুযোগও ঘটিয়া উঠে নাই।

এইরূপে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত কেবলমাত্র বৃদ্ধা স্ত্রী রোগিণীগণ ব্যতীত অল্পবয়স্কা রগ্না মাতৃজাতির আর কোনরূপ উল্লেখযোগ্য সেবা-শুশ্রূষা সেবাশ্রমে হওয়া সম্ভব হয় নাই।

সেবাশ্রমে পুরুষ বিভাগ পূর্ণাঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় স্বাভাবিকভাবেই বিগত দিনগুলির হিসাব করিতে গিয়া চারুচন্দ্রের মনের মধ্যে এই অভাবের দুঃখরাশি জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি সেবকগণ সঙ্গে এই অভিনব কাজে ব্রতী হইলেন বটে, কিন্তু এই বিভাগ যে কি উপায়ে আপন কার্য্য উদ্ধার করিবে, তাহার কোন পথই তখন তাঁহার সম্মুখে বাস্তবিক উপস্থিত ছিল না।

কিন্তু অদম্য উদ্যোগী চারুচন্দ্র ভাবিলেন, যে বিশ্বে পার্ব্বতী-পরমেশ্বর "বাগর্থাবিবসংপৃক্তৌ" অর্থাৎ বাক্য এবং অর্থ যেমন দুইটি পরস্পর সর্ব্বদা মিলিতই আছে—সেইরূপ জগৎ-পিতা এবং জগন্মাতা নিয়ত যে-বিশ্বে সর্ব্বত্র মিলিত

হইয়া আছেন, সেখানে আশ্রমের সেবা-কল্পনা সম্পূর্ণাঙ্গ করিতে নিশ্চয়ই তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ স্বতঃই আসিবে। এই ভরসাতেই তাঁহার হৃদয় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

যে সময় বারাণসীতে বসিয়া চারুচন্দ্র এই সব ভাবিতে-ছিলেন, সেই সময় সুদূর কলিকাতাতে আর একটি প্রাণেও ঐরূপ একটি চিন্তার ধারা উঠিয়াছিল—অথচ তাঁহারও অন্তরের কথা কেহ জানিতেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণমিশন বাগবাজারে যে বালিকা বিদ্যালয়টি পরিচালন করিতেছিলেন, তাহা মহীয়সী ভগিনী নিবেদিতার স্থাপিত। ১৯১৭ সালে উহার প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং প্রবন্ধকর্ত্রী ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী সুধীরা দেবীর নিকট হইতে অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র সংবাদ পাইলেন যে, যদি অধ্যক্ষ মহোদয় ইচ্ছা এবং অনুমতি করেন, তবে কাশীতে বিপন্না অসহায়া, অল্পবয়স্কা, বিধবা এবং বালিকাগণের জন্য সেবাশ্রম একটি নূতন বিভাগ স্থাপন করিলে, উহার পরিচালন-ভার তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। অধিকন্তু, নিবেদিতা বিদ্যালয় হইতেও ঐ কার্য্যের ব্রত গ্রহণের উপযুক্তা মহিলাগণও তাঁহার সঙ্গিনী হইতে ইচ্ছুক আছেন।

পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মচারিণী সুধীরা দেবী বারাণসীতে আসিয়া আশ্রমের কার্য্যাদি দর্শন করিয়াছিলেন এবং চারুবাবুর সহিত এই বিষয়ে আলাপাদি করিয়াছিলেন, তখন হইতেই জননীজাতির দুঃখ ও দুর্দ্দশার চিন্তা তাঁহার মনে

বদ্ধমূল হইয়াছিল ; কিন্তু তখন তিনি কিছুই প্রকাশ করেন নাই। কলিকাতায় যাইবার পরও অনেক সময় তাঁহার মন, বারাণসীর এই দৃশ্যগুলির কথা স্মরণ করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কিন্তু, বহুদিন তিনি কিছুই বলিবার অবসর খুঁজিয়া পান নাই। এতদিনে আরও দুইটি মহিলার সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাঁহার মন আবার নূতন প্রেরণায় জাগিয়া উঠিল। তখন তিনি নিজেই স্থির করিলেন, ঐ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেই হইবে। পরে মহিলাদ্বয়কেও এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করিলেন। তার পরই আপন সঙ্কল্পের কথা চারুচন্দ্রকে জানাইলেন।

ব্রহ্মচারিণী সুধীরা দেবীর নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া চারুচন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি সেবাশ্রম কমিটির সভ্য শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত কথোপকথনে বিশেষ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া অল্পবয়স্কা অসহায়া মহিলাগণ ও বালিকাদিগের জন্য একটি আশ্রয়-স্থান স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে তিন হাজার টাকা মূল্যে আশ্রমের নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র বাটিও ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু, এরূপ মহিলাদিগকে সদ্ভাবে পরিচালনের উপযুক্ত মহিলা সেবিকার অভাবে ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ঘটে নাই। এক্ষণে ব্রহ্মচারিণী সুধীরা দেবীর প্রস্তাবে ঐ বাটিতে বিপন্না, অল্পবয়স্কা বিধবা এবং বালিকাদের জন্য একটি শাখা-আশ্রম স্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

যদিও আকাঙ্ক্ষিতরূপে উহা সম্পূর্ণভাবে সফল হইতে পারিল না, তবুও দশাশ্বমেধে যেমন অসহায়া বর্ষীয়সী বিধবাদের জন্য ইতিপূর্ব্বে শাখা-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, সেইরূপ এখানে অল্পবয়স্কা অসহায়াগণের আশ্রম স্থাপিত হইলে এক দিক দিয়া জননীগণের সেবার অঞ্জলি কতক পরিমাণে দেওয়া হইবে এবং তদ্দ্বারা দেশের ও তাঁহাদের মনে শান্তি আসিবে। এই সকল ভাবিয়া চারুচন্দ্র সেবকগণ সহ ১৯১৮ সালে ব্রহ্মচারিণী শ্রীমতী সুধীরা দেবীর এবং নিবেদিতা বিদ্যালয় হইতে আগতা অপর জনৈক মহিলার তত্ত্বাবধানে ঐ বাটিতে অল্পবয়স্কা বিধবা এবং বালিকাগণকে লইয়া একটি আশ্রম বিভাগ খুলিলেন। আশ্রমে ১৮ জন অসহায়ার স্থান হইল।

যাঁহারা অসহায়া, তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া কেবল তাঁহাদের অন্ন-সংস্থান এবং শুধু ভরণপোষণই যে এই আশ্রমের উদ্দেশ্য ছিল, তাহা নহে। যাহাতে আশ্রম-বাসিনীরা সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগঠনের অনুকূল ভাব, শিল্প শিক্ষা এবং নিজ নিজ জীবনে ভবিষ্যতের জন্য একটি গন্তব্য পথ পাইতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হইল এবং তাহা ব্যতীত নীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহাদিগকে প্রতিনিয়ত সম্ভবমত উপযুক্ত শিক্ষাও দেওয়া হইত।

এই বিভাগের কাজ কিছুদিনের মধ্যেই বেশ সুচারুরূপে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আশ্রিতাগণ জীবনে অন্ধকারময়

মহাসমুদ্রে পড়িয়া যেরূপ হতাশ এবং কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এইখানে আসিয়া তাঁহারা যেন পরম শান্তি পাইলেন। শুধুই যে তাঁহারা শান্তি পাইলেন, তাহা নহে—তাঁহারা যেন এক অপূর্ব্ব নবজীবন পাইলেন। প্রতিপলে যাঁহারা মৃত্যুকেই কামনা করিতেছিলেন, এখন এই শান্তি-গৃহে আসিয়া আবার তাঁহাদের বাঁচিবার সাধ হইল। তাঁহারা একটা কল্পনার অতীত জীবনের সাধও যেন এখানে আসিয়া ফিরিয়া পাইলেন।

আশা ও উৎসাহের নূতন বৃক্ষটি পত্রপুষ্পে শোভিত হইয়া উঠিতে চলিতেছিল, কিন্তু বিধাতার কোন্ মঙ্গলময় ইচ্ছা ইহার পরবর্ত্তী বিষাদময় ঘটনার মধ্যে ছিল, তাহা কে বুঝিবে?

শ্রীমতী সুধীরা দেবী তীর্থ-ভ্রমণে প্রয়াগ হইতে ছোট লাইনে অর্থাৎ বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে লাইনে কাশী ধামে আসিতেছিলেন। কাশীর নিকটবর্ত্তী একটি ষ্টেশনের কাছে গাড়ী পৌঁছিলে হঠাৎ কি-রকমে গাড়ীর দরজা খুলিয়া যায় এবং শ্রীমতী সুধীরা সহসা সেই দরজাদিয়া গাড়ী হইতে পথে পড়িয়া যান; তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গিনীগণ গাড়ী থামাইবার জন্য শিকল টানেন, কিন্তু শিকল টানিতে টানিতেও গাড়ী অনেক দূর চলিয়া আসে—তার পর অনেক চেষ্টায়, গার্ড গাড়ী পিছনে হটাইয়া লইয়া গেলেন এবং সেখানে উপস্থিত হইবার পর তাঁহাদের বহুপ্রকার চেষ্টাতেও অজ্ঞান অবস্থায়

পতিতা শ্রীমতী সুধীরা দেবীর সংজ্ঞা হইল না। অতঃপর তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে আনা হয়। ঐ ট্রেনের যাত্রিগণের মধ্যে স্যার রাজা মতিচাঁদ সাহেব ছিলেন;—তিনি তাঁহার প্রাসাদের নিকট মরুয়াডি ষ্টেশনে পঁহুছিয়াই মটর-যোগে এই সংবাদ আশ্রমে প্রেরণ করেন;—তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। তৎক্ষণাৎ আশ্রম হইতে সেবকগণ ষ্ট্রেচার সহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমতী সুধীরা দেবীকে আশ্রমে আনয়ন করেন। আশ্রমের অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিলেন। সেই সময়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং অবসর-প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় কাশীধামে ছিলেন; সকলে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সুধীরার আর জ্ঞান হইল না। অজ্ঞান অবস্থায় প্রায় ২২ ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল, কিন্তু জ্ঞানোদয় আর হইল না। দ্বিতীয় দিবস অপরাহ্লে আকাশের মেঘমালা যখন রক্তিমবর্ণ ধারণ করিয়া স্তরে স্তরে এপার এবং ওপারের পথের মধ্যস্থলে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মধ্য দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মি স্বর্গে এবং মর্ত্তে পথরেখা আঁকিয়া দিতেছিল; দূরে জাহ্নবীর জলে সূর্য্যরশ্মির বিদায়ের শেষ চুম্বন লহরীমালার উপরে বিদায়ের শেষ দৃশ্য লিখিয়া যাইতেছিল; বিশ্বনাথের স্বর্ণমন্দিরের ডমরুর

প্রথম ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাশীধামময় আরতির কাঁশর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, সেই পুণ্যক্ষণে স্বয়ং সন্ধ্যাদেবী আলো ও আঁধারের যেন দুইটি হাত বাড়াইয়া পুণ্যপ্রাণা পবিত্র পুষ্পপ্রতিমা শ্রীমতী সুধীরাকে আপন কোলে উঠাইয়া চির অনন্তের পথে চলিয়া গেলেন।

বাজো হে শঙ্খ! বাজো হে কাঁশর! হে ডমরু! হে বিষাণ! এই তো পরমধাম কাশীক্ষেত্রে তোমাদের বাজিবার উপযুক্ত সময়। যিনি জীবনে সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও সমস্ত ব্যাকুলতা বিল্বদলের মত নিখিলাত্মা শিবের অর্চ্চনার জন্য অঞ্জলি দিয়া দিলেন, তাঁহার এই বিজয়-যাত্রার সময়ে বাজিবে না তো কখন বাজিবে? বাজো জগজ্জনের কর্ণকুহরে, তাঁহার আনন্দধামে গমনের আনন্দ-সংবাদ দিকে দিকে প্রচার করিয়া, নিখিলজনের প্রাণে সেবার মধুরিমা এম্‌নি সন্ধ্যার রাগে রাঙ্গাইয়া দিয়া, বিপুল করুণ সুরে—আরও পরম সাধনার সুরে আজ বাজো। শত শত অনাথা-অসহায়ার প্রাণের কৃতজ্ঞতার কুসুমাস্তীর্ণ, বিশ্ব-মানবের আশীর্ব্বাদ-চন্দন-চর্চ্চিত মঙ্গল পথ দিয়া, সেই মহাসেবিকা আজিকার এই সন্ধ্যা ধন্য করিয়া চলিয়া গেলেন। আশ্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে একদিকে প্রাণের অশ্রু ঝরিতেছিল, আর একদিকে আশ্রমে ও সমস্ত কাশীতে আনন্দের আলোক জ্বলিয়া উঠিতেছিল। তাঁর যাত্রাপথের চারিদিকে যেন আজ উদ্দীপ্ত প্রাণের দীপদাম কাশীধামকে সুন্দর করিয়া তুলিতে লাগিল।

অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া আশ্রমের সেবকগণ মনে করিতেছিলেন যে, তাঁহাদের সকল সেবা সার্থক, আশ্রম সার্থক। এমন একজন সেবিকাকে যে এই আশ্রম লাভ করিয়াছিল—আশ্রমের জীবন তাহাতে ধন্য হইল।

কে জানিত, যেদিন কলিকাতা হইতে এই নবীন আশ্রমের সেবার উদ্দেশ্যে তিনি আপন প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন, সেই আশ্রমের কাজে আজ এমন করিয়া তিনি তাঁহার প্রাণখানি বিলাইয়া দিবেন। করাল কাল অকস্মাৎ যে অতর্কিতভাবে তাঁহাকে লইয়া গেল, তাহাতেও দুঃখিত হইবার অপেক্ষা, হয়ত আশ্রমের আনন্দের ভাগ অধিক।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সুধীরা চলিয়া গেলেন। তাঁহার কাজ, যেটুকু তাঁহার করিবার ছিল, তাহা শেষ করিয়াই তিনি গেলেন। কিন্তু এমন আর কোন মহিলা কর্ম্মী আশ্রমে ছিলেন না বা এমন কাহাকেও পাওয়া গেল না, যিনি সুধীরার আরব্ধ কাজ ঐভাবে বা উহা অপেক্ষা লঘুতর ভাবেও চালাইয়া উঠিতে পারেন। এই নূতন আশ্রমের দায়িত্ব ছিল বড় বেশী। এখানকার আশ্রিতারা অল্পবয়স্কা ছিলেন বলিয়া, এই আশ্রমের পরিচালনা অত্যন্ত সাবধানতা এবং দায়িত্বের সহিত করিতে হইত। এজন্য উপযুক্ত পরিচালিকা না পাইলে সেবাশ্রম যেমন-তেমন ভাবে উহাকে পরিচালন করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিছুদিন চেষ্টা চলিল, কিন্তু দুই তিন মাসের মধ্যেও উপযুক্ত লোক পাওয়া গেল না। কাজেই, যাঁহারা এই আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েকজনকে সম্ভবমত অর্থ-সাহায্য করিয়া অন্যত্র থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। কয়েকজন কিঞ্চিৎ অধিক-বয়স্কা বিধবাকে এবং কয়েকটি বালিকাকে দশাশ্বমেধ শাখা আশ্রমে অস্থায়িভাবে স্থান দেওয়া হইল। আর

কয়েকটি বালিকাকে—যাহারা লেখাপড়া শিখিতে একটুকু অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদিগকে কলিকাতা নিবেদিতা স্কুলে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া গেল। আর তিন জন প্রৌঢ়া বিধবা পীড়িতা মহিলাদিগকে সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্বেচ্ছায় আশ্রমের মহিলা সেবিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিলেন।

এইরূপে আশ্রমের মহিলা-বিভাগ এইবারে একটুকু বর্দ্ধিতকলেবর হইল, কিন্তু অসহায়া দুঃস্থ মহিলাদিগকে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্ত্রীলোকদিগকে আশ্রয় দিবার বিষয়ে পূর্ব্বের এবং এখনকার নানারূপ অসুবিধা এবং বিঘ্ন সর্ব্বদাই চলিতে থাকায়, এবারে বিশেষ করিয়া আশ্রম-পরিচালকগণের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন, মহিলা বিভাগ সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া তদনুযায়ী আশ্রমের মহিলা বিভাগ পরিচালন করিতে হইবে। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজকে আমন্ত্রণ করিয়া কাশীধামে আনয়ন করিলেন। তিনি সেবকগণের নিকট হইতে সমস্ত বিষয় শুনিয়া এবং পরিচালকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন আশ্রমের বিষয় সুব্যবস্থা প্রদান করিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ এবং উপদেশ অনুযায়ী আশ্রমের মহিলা বিভাগকে পুরুষ বিভাগ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করা হইল এবং বিশেষ বিবেচিত

❊ ❊ ❊

মহিলা বিভাগের একাংশের দৃশ্য

কতকগুলি নূতন নিয়মানুসারে এই মহিলা বিভাগের পরিচালনের ব্যবস্থা হইল।

মহিলা বিভাগ লইয়া উহার পরিচালনের অধ্যক্ষের যে অভাব অনুভূত হইতেছিল, একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা এই সময়ে আসিয়া আশ্রমে যোগদান করায়, সে সমস্যার অনেক পরিমাণে সমাধানও হইল। তাঁহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাই তাঁহাকে কর্ম্মে ব্রতী করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মক্ষমতা কতকটা অবশ্য বাড়িয়া চলিবে, এই আশা সেবকগণ করিতেছিলেন এবং এজন্য তাঁহাকে বর্ত্তমান কর্ম্মভার অর্পণ করায়, আশ্রমের কার্য্য পুনরায় নবীন উদ্যমে চলিতে লাগিল।

নূতন নিয়মে কার্য্য আরম্ভ করিবার পরই দশাশ্বমেধের আশ্রমে যে বালিকাগণ ছিল, তাহাদিগকে এখানে আনা হইল এবং আরও কয়েকটি অনাথা বালিকাকে লইয়া বালিকাদের জন্য একটি শিক্ষাবিভাগ আবার নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল। স্বর্গীয়া সুধীরা দেবীর অভাবে বালিকাগণের শিক্ষার কাজ আশ্রমে পুনরায় ঘটিবার সম্ভাবনা না থাকায়, তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু, তাহাদের তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ ভার বিশেষ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাখা হইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত রোগিণীগণের সেবা-শুশ্রূষার জন্য শিক্ষাদানের—ও অবসরকালে বালিকাদিগকে সহজ সহজ সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, সেবা বিষয়ে

তাহাদিগকে সমর্থ করিয়া তুলিবার চেষ্টাও হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিতরূপে প্রত্যহ তাহাদের দৈনন্দিন জীবনে নীতি এবং ধর্ম্ম বিষয়ে উপযুক্তরূপ আচরণ এবং শিক্ষার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিও রাখা হইতে লাগিল। এই ভারতে নারীজাতির প্রধান যেটুকু বিশেষত্ব, এই সব পবিত্র কুমারীগণের হৃদয়ক্ষেত্রে তাহার বীজ এখন হইতেই যাহাতে অঙ্কুরিত হইতে থাকে, তৎপ্রতিও আশ্রমের বিশেষ দৃষ্টি রহিল।

এইরূপে ক্রমশঃ সেবাশ্রমের মূলে যে উদ্দেশ্য ছিল—নূতন মহিলা বিভাগে সেই উদ্দেশ্যের প্রাণ ক্রমে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। যাহাতে আশ্রিতাগণের আত্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আতুর অসহায় এবং রুগ্না জননীগণের সেবায় মনঃপ্রাণ ঢালিয়া—তাঁহারা নরনারায়ণের পূজার মহত্ত্ব জীবনে উপলব্ধি করিয়া সেই ভাবেই জীবনকে সার্থক করিতে পারেন এবং এই স্ত্রীজাতি বিশ্বমাতার আপন স্বরূপকে জানিতে পারেন, সেইদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইল। এই উদ্দেশ্যে ক্রমে ক্রমে এখানকার নারী কর্ম্মিণীগণ আপন আপন আকাঙ্ক্ষা এবং উৎসাহের গুণে সহজভাবে এমন করিয়া ব্যাপৃত হইতে লাগিলেন যে, তাহাতে এলোপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত করা ও অস্ত্রচিকিৎসিত রোগিণীগণের ব্যাণ্ডেজ বন্ধন প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কাজও শিক্ষা করিয়া, ক্রমে তাঁহারাই মহিলা বিভাগের সমস্ত কাজ পুরুষ সেবকদিগের সাহায্য ব্যতিরেকেও এক্ষণে পরিচালন করিতেছেন। মাত্র পুরুষ ডাক্তার মহোদয়গণ,

নিত্য রুগ্নাদিগকে দেখিয়া ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়া আসেন এবং আশ্রম-অধ্যক্ষ নিত্য সর্ব্ববিষয়ে মহিলা কর্ম্মিণীগণকে সাহায্য এবং উপদেশ দিয়া থাকেন।

মহিলা বিভাগের অপর আর একটি দিকেও এইরূপ ভাবে ক্রমশঃ যথাসম্ভব উন্নতি হইয়া আসিতেছে। একান্ত অসহায়া যে সমস্ত বালিকা, জীবনে যাহাদের কোনরূপ সাফল্যের ভরসা ছিল না, তাহাদের মধ্যে যাহাদের হৃদয়াসনে বাণীর আশীর্ব্বাদ পড়িয়াছে, সেই সমস্ত কুমারীগণের কেহ কেহ এখন স্কুল ও কলেজে উচ্চশিক্ষা পাইতেছে। এরূপভাবের সার্থকতা সুধীরা দেবীর অভাবের পরে, এতটুকুও যে হইতে পারিবে, তাহা পূর্ব্বে ভাবিতে পারা যায় নাই।

এই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য দুঃস্থ, পীড়িত এবং বার্দ্ধক্যগ্রস্তদিগকে সর্ব্বাগ্রে সাহায্য করা বা সেবা করা, অর্থাৎ যাঁহারা অর্থের অভাবে রোগে এবং শারীরিক অসামর্থ্যে নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদেরই আশ্রয় এই সেবাশ্রম; সুতরাং এই ভাবের একটি বিরাট্ কার্য্যের সঙ্গে তথায় সুকুমারমতি বালিকাগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত সম্ভবপর হইবে না।

তবে ঈশ্বর-ইচ্ছায় যতদূর যাহাকে সাহায্য করা যায়, ততটাই ভাল এই বোধে যতদূর উহা অগ্রসর হইয়াছে এবং আর যতকাল উহা পরিচালন করা যায়, তাহার জন্য সেবাশ্রম সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিবে।

জীবনের নিরাশাকে দূর করিয়া দিয়া ভারতের নারীজীবন যে মনুষ্যত্বের কত উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে পারে এবং সেবাভাবের ও নিষ্কাম ভাবের বিরাট্ কর্ম্ম-ক্ষেত্র কত অসীমরূপে বিস্তৃত হইতে পারে, তাহার উজ্জ্বল আদর্শের কণামাত্রও যদি আশ্রমের অনুষ্ঠান হইতে ঘটে, তবে আশ্রমের সকল প্রচেষ্টা সার্থক হইবে।

প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া এবং বহু বাধা ও দারুণ আঘাত খাইয়া এই মহিলা বিভাগটি আজ যেস্থানে আসিয়া পঁহুছিয়াছে, তাহা চারুচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষিত ভাবের অন্ততঃ কাছাকাছি কি না, জানি না; কিন্তু তাহা না হইলেও উহা যে সাগরগামিনী জাহ্নবার মতই বাঞ্ছিতের দিকেই চলিতেছে, তাহা বলিলে বেশী বলা হয় না। যদি কোন-দিন সুধীরা দেবীর মত মহাপ্রাণা, পবিত্রা ও সংযতা সেবিকার আবির্ভাব এই আশ্রমে আবার হয়, তবেই চারুচন্দ্রের হৃদয়ের আশা হয়ত পূর্ণরূপে সফল হইবার পথে দ্রুতবেগে চলিবে। সেবকগণ সে আশা সমস্ত নিরাশার মধ্যে এখনও হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

১৯২০ সালের কোনও দিনে প্রথমে কয়েকটি অনাথ বালক সেবাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সংখ্যা ইহার পর হইতে ক্রমে ক্রমে বাড়িতে লাগিল। যে কোমল হৃদয়গুলি সংসারের দুঃখ-দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ও ভীষণ ভ্রুকুটিতে চির-বিদলিত হইয়া যাইবার পথে চলিতেছিল, আশ্রমে ভগবান্ বিশ্বনাথ যে তাহাদেরও ঠাঁই করিবার সূত্রপাত করিবেন, তাহা ঐ সময়ের পূর্ব্বে বোঝা যায় নাই। এখন অনাথ বালকের সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে চলিল। এইবার চারুচন্দ্রের সহকারী স্বামী কালিকানন্দজী এই আর একটি নূতন বিভাগের অনুষ্ঠানের বিশেষ ব্যবস্থাও করিতে লাগিলেন। মহিলা আশ্রমে যেমন সব রকমের ভিতর দিয়া বালিকা ও বয়ঃস্থা মহিলাদিগকে মানবত্বে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছিল, এই বালক অনাথ বিভাগেও সেইরূপ বিভিন্ন প্রকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া অসহায়ত্ব ঘুচাইয়া দিয়া, তাহাদিগকে পূর্ণ মানুষ করিবার—যতদূর সম্ভব, প্রয়াসও চলিতে লাগিল।

বালকগণের স্বাস্থ্য এবং সাধারণ শিক্ষার বিষয়ে নিয়মিতভাবে ব্যবস্থা হইল, তদ্ব্যতীত চরকাযোগে সূতাকাটা এবং বয়নাদিরূপ শিল্পকার্য্যেও তাহাদিগকে নিযুক্ত করা

হইল। ইহার ফলে ১৯২৫ সালের মধ্যে পাঁচ বৎসরে দুইটি বালক প্রবেশিকা (Matriculation) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল, কয়েক জন বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিল, কয়েকজন উত্তম সূতা কাটা এবং তাঁতে কাপড় বোনা প্রভৃতি শিক্ষা করিল। ইহাদের এইরূপ ক্রমোন্নত অবস্থা দেখিয়া তাহাদেরই প্রার্থনামতে তাহারা যাহাতে অকর্ম্মণ্যতার দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া আপনাদের নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহারও অবসর তাহাদিগকে দেওয়া হইল। আর বিদ্যার্থী যাহারা বাকী রহিল, তাহাদিগের সংখ্যা অল্প বলিয়া ১৯২৫ সালে তাহাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণমিশনপ্রতিষ্ঠিত দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ নামক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

এইরূপে অনাথ বালকদের বিভাগটির সমস্ত অনাথই বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হইয়া পড়াতে ১৯২৬ সালের প্রথমে এই বিভাগটির আবশ্যকতা না থাকায়, উহার জন্য অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন মনে হয় নাই।

বয়ন বিভাগের জন্য যে অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল, তাহার শিক্ষার্থিগণ শিক্ষালাভ করিয়া বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ায়, সূতাকাটা, মোজাবোনা, খদ্দর প্রস্তুত করা প্রভৃতির যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাও স্থগিত করা হইল।

আশ্রম একটি দুঃস্থ, পীড়িত এবং অথর্ব্বগণের আশ্রয়-ক্ষেত্র এবং বৃহৎ সেবানুষ্ঠান। তাহাতে বিভিন্ন শ্রেণীর সুকুমার-মতি বালকদিগকে রাখিয়া যথার্থ সংশিক্ষা দেওয়া কঠিন বোধে, তথায় অনাথ বালকগণের বিভাগটি সংরক্ষণ করা চলে না দেখিয়া আশ্রমে এই বিভাগটিকে কিছুদিন অস্থায়িভাবেই রাখা হইয়াছিল, আবার যদি কখনও আবশ্যক হয়, তবে আশ্রম সাধ্যমত তাহার পুনঃ সংস্থাপন করিতে প্রস্তুত আছেন।

এই বিভাগটির যতটুকু আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা কতক পরিপূর্ণ হওয়াতে এবং ভবিষ্যতে ইহার পরিচালন অনাবশ্যক বোধে ইহার কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে, কিন্তু ইহার অনুষ্ঠানের দ্বারা আশ্রমাঙ্গের পূর্ণতারই সূচনা হইয়া রহিয়াছে।

বালক অনাথদের ব্যাকুল হৃদয়ের আহ্বান যে এইখানে আসিয়া কতকটা শান্তি পাইয়াছে, তাহাতেই সহৃদয় দাতৃগণের এবং আশ্রমকর্ম্মিগণের আংশিক তৃপ্তি।

সপ্তদশ অধ্যায় ।

শৈশব হইতে আরম্ভ করিয়া আজ আশ্রম তাহার যৌবনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একদিনের অতি প্রত্যূষের একখানি সিকির উপর 'নারায়ণের' যে চরণ স্পর্শ পড়িয়াছিল, আজ সেই সুদুর্লভ চরণ স্পর্শের গুণে তাহা পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। কত বিপদের কণ্টক, কত নিরাশা-দুর্দ্দশার কীট, কি বিষম ঝড়-ঝঞ্ঝা ইহার উপর দিয়া গত দীর্ঘকাল ধরিয়া যে গিয়াছে, তাহা কয়জন জানে? বিংশ বর্ষের অক্লান্ত পরিশ্রম, বিংশ বর্ষের মহাব্রত, বিংশ বর্ষের চারুচন্দ্রের জীবনোৎসর্গের দৈনন্দিন অঞ্জলি এবং হিতৈষী ও সেবকগণের হৃদয়ের রক্ত-ঢালা সেবার প্রভাবে 'নারায়ণ' এই পদ্মটিকে আজ পূর্ণভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন। কর্ম্মকুশল চারুচন্দ্র হালের মাঝির মত আশ্রমের সকল অবস্থায় সতর্ক থাকিয়া এবং মনঃপ্রাণ দিয়া ইহার লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিয়াছেন। বিপদ্ তাঁহাকে টলাইতে পারে নাই, নিরাশা তাঁহাকে ভুলাইতে পারে নাই, দিনের পর দিন ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ের আরাধনার এই কমলটি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক রেণুতে চারুচন্দ্রের হৃদয়বত্তা, চারুচন্দ্রের অশেষ ধৈর্য্য, চারুচন্দ্রের গভীর শ্রম, চারুচন্দ্রের কর্ম্মকুশলতা আর চারুচন্দ্রের একনিষ্ঠ সাধনা ও ভালবাসা ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া রহিয়াছে।

যে সহরের পথে-ঘাটে অনাবৃত আকাশতলে দুঃস্থ, পীড়িত ও অথর্ব্বের আকুল ক্রন্দন পথিকের শ্রবণ-নয়নের বাধা জন্মাইত, সেই বারাণসীর এক অনাদৃত পল্লীর যে ভূমিটুকু গুল্মলতায় আচ্ছাদিত হইয়া এত কাল পড়িয়াছিল, আজ তাহারই বুক জুড়িয়া কত অনাথ-আতুরের শান্তির আলয় নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই সেবাশ্রমে এই দীর্ঘকাল ধরিয়া গৃহীরা আসিয়া সেবার আদর্শ দেখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের গৃহে আপন সেবাধর্ম্মের তাহাতে কতটা না জানি সহায়তা করিয়াছে। এখানে কত ধনবান্ আসিয়া দুঃখী-আতুরের সেবা দর্শন করিয়া নিজের জীবনে যেমন তাহাদের জন্য ভাবিবার একটু অবসর পাইয়াছেন, তেমনই সামর্থ্যানুসারে দান করিয়া ধন্যও হইয়াছেন। আর দীন-দরিদ্রেরা—যাহারা জগতে একরূপ নিরবলম্ব অবস্থায় দিন ও রজনী কাটায়, তাহারা ভাবে যে, তাহাদের বিপদের দিনে একটা আশ্রয় এখানে আছে। এইরূপে কি ক্ষুদ্রে, কি বৃহতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই সেবাশ্রম একদিক দিয়া যেমন যোগসূত্রের সৃষ্টি করিয়াছে, তেমনই ক্ষুদ্র-বৃহতের মহাজীবন-সাধনার যোগ-ক্ষেত্রেরও সৃষ্টি করিয়াছে। কাহার নয়ন এখানে আসিলে গলে না, কাহার বুক এখানে আসিলে স্পন্দিত হয় না, কাহার অন্তর এখানে আসিলে জাগে না!

এই জাগরণের নিদান ঐ সর্ব্বহারা রিক্ত পুরুষ চারুচন্দ্রের

জীবন। তিনি নিজের জীবনের সমস্ত সাংসারিক সুখ-দুঃখ এবং সকল সম্পর্ক ও কর্ম্ম জাহ্নবী-জলে সমর্পণ করিয়া সেবার এই মন্দাকিনী-ধারায় আপনাকে বহাইয়া দিয়াছিলেন। এ মহাযজ্ঞ তাঁহারই শোণিতের আহুতিতে, হৃদয়ের অগ্নিতে এবং জীবনের ত্যাগ মন্ত্রে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। বারাণসীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবের এই জাগরণ চারুচন্দ্রই আনিয়া দিয়াছেন। এক দিনে নহে—দিনে দিনে, পলে পলে, যোদ্ধা বীর যেমন আপনার সমস্ত সামর্থ্য নিযুক্ত করিয়া দিয়া যুদ্ধ-জয়ের উপাদান প্রস্তুত করে, তেমনি করিয়াই চারুচন্দ্র এইখানে দেশের মানুষের কাছে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের মহাকেন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন। বহু কঠোর তপশ্চরণে ভারতে লুপ্ত মানবতার এই জয়—চারুচন্দ্র সকলের দুয়ারে দুয়ারে আনিয়া দিয়াছেন। এখানে ভেদাভেদ নাই, এখানে নৈরাশ্যের পরাজয় নাই, এখানে সমস্ত অন্ধকারের মধ্যে যেন একটি অবিচ্ছিন্ন আলোকের ধারা আবার বহুযুগের পর ভারতবাসীর সম্মুখে জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

মানুষের যে সকল বাহ্য ভূষণ, ধন-বল, মান-বল, যশোবল, বিদ্যা-বল ও খ্যাতি-বল, এ সমস্তই তো দুই দিনের কি চারি দিনের জন্য, কিন্তু মানুষ যে মানুষ,—মানুষ যে আপনাতে প্রত্যয়শীল হইতে পারে—মানুষের যে প্রাণের সন্ধান পাইবার একমাত্র সাধন সেবা, সেই সেবার ও আত্মপ্রত্যয়ের জাগরণ এমন ভাবে সার্থক ও প্রত্যক্ষ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন, চারুচন্দ্র।

যে অমরত্ব লাভের কথা ভারত যুগে যুগে বিশ্বমানবকে শুনাইয়াছে, কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সেই অমরত্ব এবং পূর্ণ শান্তি পাওয়া যায়, আচার্য্যদেব বিবেকানন্দজীর শিক্ষার সেই গূঢ় রহস্য চারুচন্দ্র আপন হৃদয়-পদ্মে ফুটাইয়া সেই অমৃত সকলের কাছে আনিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু মকরন্দ বিলাইয়া দিয়া কমল যেমন ক্রমে শুকাইয়া বিলীন হইয়া যায়, সেবাশ্রমের এই মধ্যাহ্ন দিনের শেষে তেমন করিয়াই চারুচন্দ্র জীবনের অবসানের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; কেহ এ কথা জানিল না, দিনের শেষে রাঙ্গামেঘে সূর্য্যরশ্মি যেমন আপনি মিলায়, তেমনই কর্ম্মের সজীবতার মধ্যেই আপনার কর্ম্মকে তিনি উদাসীনতার পথে আনিতে আরম্ভ করিলেন। যে সকল কর্ম্মীর সঙ্গে এতকাল তাঁহার সাধনা চলিতেছিল, তাঁহাদেরই হাতে তিনি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া দিয়া, সুদীর্ঘ বিংশ বর্ষ পরে সকলের চক্ষুর অন্তরালে আপনার আশ্রয়স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। নির্দ্দিষ্ট আশ্রয়ে নির্দ্দিষ্ট ভাবে তিনি যে কোন্ পরম অনির্দ্দেশ্যের মঙ্গল আহ্বান শুনিতে লাগিলেন, তাহা জানিবার ক্ষমতা কহার আছে ?

১৯২১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের ২৯ শে তারিখে শ্রীশ্রীস্বামীজীর উৎসবের পূর্ব্বদিন রাত্রে একজন সেবককে ডাকিয়া তিনি বলিলেন—অতঃপর কালীবাবুই (কালিকানন্দ) আশ্রমকার্য্য পরিচালন করিবেন। এখন আমার ছুটি এবং ইহাই বোধ হয় আমার শেষ ছুটি। এইরূপ

কথাবার্ত্তার পর তিনি শয়ন করিলেন। প্রভাতে উঠিয়া আশ্রমে আর তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইল না। এই ভাবেই চারুচন্দ্র নীরবে আশ্রম হইতে বিদায় লইয়া প্রয়াগে ত্রিবেণীসঙ্গমে চলিয়া গেলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

জাহ্নবীর শুভ্র জলতরঙ্গ যেখানে মসী-উজ্জ্বল সুন্দর যমুনার জলের সহিত মিলিত হইয়াছে—তাহারই অতি সন্নিকটে ঝুঁসী নামক তপোভূমির একটি ক্ষুদ্র কুটীরে চারুচন্দ্র আপন আসন স্থাপন করিয়াছেন। নির্ভীকহৃদয় চারুচন্দ্র যেমন নির্ভীকভাবে বিংশবর্ষকালব্যাপী কর্ম্মোপাসনা করিয়াছেন, তেমনই নির্ভীকচিত্তে সকল কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া ততোধিক নির্ভীক প্রাণে এই তীর্থরাজে আসিয়া অবস্থান-পূর্ব্বক তিনি ধ্যানোপাসনায় দিন অতিবাহিত করিতে-ছিলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া দুই তিন জন সাধু একটু দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। সেবাশ্রম হইতে তাঁহারা গিয়াছেন। চারুচন্দ্র প্রথমে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নান করিতে গেলেন এবং স্নানান্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের পরস্পরে কথোপকথন চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন্ যে সূর্য্যদেব পশ্চিমদিগন্তরালে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তাহা তাঁহারা কেহ জানিতেও পারিলেন না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চারুচন্দ্র সেবকদিগের সহিত আবশ্যক আলোচনা ও আলাপে যাপন করিলেন। মধ্যরাত্রির ট্রেনে তাঁহাদের একজন সেবক চারুচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া

কাশীধামে যাত্রার জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। চারুচন্দ্রও বিশ্রামার্থ আপন আসনে শয়ন করিলেন। সূর্য্যোদয়ের ঈষৎ পূর্ব্বে পাখীর কলগানের সঙ্গে সঙ্গে চারুচন্দ্র গাত্রোত্থান করিয়া, কমণ্ডলু হস্তে প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে ঈষৎ কুয়াসাচ্ছন্ন সঙ্গমতটে গমন করিলেন।

জাহ্নবী ও যমুনার তীর দূরে অতি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। কুয়াসাচ্ছন্ন বিরাট্ দুর্গ একটি দৈত্যপুরীর মত দেহ এলাইয়া দিয়া পড়িয়া আছে। গঙ্গার জলরাশির উপরে নবোদিত সূর্য্যের আরক্ত কিরণলহরীমালা যেন পারিজাত পুষ্পের মালা পরাইয়া দিতেছিল। সেই স্বর্ণকিরণোজ্জ্বল উচ্ছল জলস্রোতে চারুচন্দ্র অবগাহন করিয়া ধীরে ধীরে আপন কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।

আজ সমস্ত তীর্থভূমি যেন কোন এক অপার্থিব সৌন্দর্য্যে এক অনির্ব্বচনীয় প্রীতিময় আবেশে আবিষ্ট হইয়া আছে; রজনীর প্রায় অবসান-কাল পর্য্যন্ত তাঁহার বিনিদ্রভাবেই কাটিয়াছে, কিন্তু কোন ক্লান্তি নাই, অবসাদ নাই, যেন দিবা এবং রাত্রির সর্ব্বপ্রকার পার্থক্য তাঁহার অন্তর হইতে মুছিয়া গিয়াছে! কি অপরূপ মুক্তির আনন্দ, অনন্ত কালের মধ্যে, সীমাহীনের মধ্যে কি অপূর্ব্ব আস্বাদ আজ তিনি অন্তর ভরিয়া উপলব্ধি করিতেছেন!

চারুচন্দ্র কাশীধামে ফিরিয়া আসিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যেদিন বিশ্বপ্রাণ ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য

শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর জন্মতিথির মহোৎসব, সেই দিন তাঁহারই নিকট চারুচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। দীপ্তিমান্ হৃদয়ের জ্যোতীরাশি লইয়া সেই দিন হইতে চারুচন্দ্র "স্বামী শুভানন্দ" নামে খ্যাত হইলেন এবং প্রাপঞ্চিক সমস্ত সম্বন্ধ কাটাইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের বাহিরে চলিয়া আসিলেন এবং পরিপূর্ণপ্রাণে নূতন আনন্দে আবার নবজীবনের সাধনা আরম্ভ করিলেন।

আজ তাঁহার নিকটে সমস্তই শুভ, তাঁহার ধ্যানে ও জ্ঞানে বিশ্ব আজ শুভময়। যেন সেবার শুভময় আনন্দজ্যোতিঃ সমস্ত অমঙ্গল-অন্ধকার নাশ করিয়া তাঁহার হৃদয়-কন্দর উজ্জ্বল করিয়া তুলিতেছে। অশিবের চিন্তা বা আশঙ্কা আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, যেন কেবল একটি জ্যোতির লহরী ভুবনকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিতেছে; যেন তাঁহার নিভৃত নিবাস আজ আপনা আপনিই পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। যেন সমস্ত বিশ্বময় একটি অনবদ্য সুন্দর লীলা তাঁহার অন্তর-পথে ছুটিয়া চলিতেছে।

এইরূপে শুভানন্দজী নিঃসঙ্গভাবে তখন অধিকাংশ সময় ধ্যান ও ধারণায় এবং তপস্যায় কাটাইতেছিলেন। আজ এ তীর্থে, কাল ও তীর্থে।

এইরূপে বিনা আড়ম্বরে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং দিনে দিনে সমস্ত কর্ম্মই যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এখন মাত্র ভিক্ষান্ন

তাঁহার উপজীবন, তাহাতেই শরীর ধারণ করতঃ তিনি কঠোর তপস্যায় নিরত রহিলেন। তীর্থের আনন্দ ও তীর্থের জন-মানব তাঁহার প্রাণ যেন পূর্ণ করিয়া রাখিত এবং তীর্থের ধূলি যেন তাঁহার হৃদয়ে অনন্ত ভাবের নূতন জগৎ আনিয়া দিতে লাগিল।

উনবিংশ অধ্যায়।

মানব-জীবনের এবং সাধক-জীবনের যাহা শান্তিময় এবং যাহা মধুময়, তাহার পরিসমাপ্তি শুধু কোন একটি সীমাবদ্ধ অংশ লইয়া হয় না। সে কেবলই পূর্ণের দিকে আপনা-আপনি ছুটিতে চায়। সফলতা কি বিফলতার দিকে সে ভ্রূক্ষেপ করে না। দিন এবং রাত্রিকে লইয়া যেমন পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সাধনার সকল কাজেই সেই রকম আশা এবং বিঘ্ন উভয়কে লইয়াই মহালক্ষ্যের দিকে সে ছুটিয়া চলে। সে জানে ক্ষুদ্রে তাহার শান্তি নাই, কেননা, পূর্ণতা প্রাপ্তিই তাহার চরম লক্ষ্য—ভূমাই তাহার গন্তব্য।

এইরূপে এই মহাকর্ম্মীর আরও চারি বর্ষ কাল অতিবাহিত হইল। ১৯২১ সাল হইতে স্বামী কালিকানন্দজী আশ্রমের অধ্যক্ষের কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছিলেন। ১৯২৪ সালের শেষ ভাগে শুভানন্দজী ৺কাশীধামে শ্রীগিরীশ্বর শিবালয়ে বাস করিতেছিলেন। কালিকানন্দ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে জানাইলেন যে:—"অতঃপর আমার দ্বারা আর আশ্রম-কার্য্য পরিচালন সম্ভবপর দেখিতেছি না, কারণ আমার মনে হইতেছে এবং দেখিতেছি, সেবকগণের মধ্যে ক্রমে আশ্রম-ভাবের বিমুখতা এবং কতকটা স্বেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করিতেছে। অতএব এই সময় যদি

আপনি আশ্রমে না আসেন, তবে উহার ভাব শীঘ্রই মলিন হইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয়। অতএব এই সঙ্কট সময়ে সেবকদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার লোক আপনি ব্যতীত আর কেহই নাই। এই কারণ আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি অদ্যই আশ্রমে চলুন।”

শুভানন্দজী কালিকানন্দের এই সকল কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন—“আমার দ্বারা আশ্রমের যদি আরও কিছু সেবা করার থাকে, ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তো আমি অবশ্যই তাহা করিব। আপনি চলুন, আমি আশ্রমে যাইতেছি।”

বিগত ১৯১৮ সাল হইতেই চারুচন্দ্র নূতন আশ্রমের আর একটি অভাব এবং তৎপূরণের কথা মাঝে মাঝে তাঁহার সহকারী সেবকদিগকে বলিতেন এবং তদ্বিষয়ে উৎসাহিত করিতেন যে, “আশ্রমের কলেবর এবং কার্য্য দিনে দিনে আশাতীত ভাবে এবং অনির্দ্দিষ্ট প্রেরণায় যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে, না জানি উহার পরিসর ভবিষ্যতে আরও কত হইবে! কিন্তু উহার সঙ্গে আমি ইহাও দেখিতেছি এবং অনুভব করিতেছি যে, কার্য্য বিস্তারের তুলনায় তাহার পরিচালনের উপযোগী প্রাণবান্ সেবক আশানুরূপ ভাবে আসিতেছে না এবং যাঁহারা হৃদয়-ঢালা পরিশ্রমে দিবানিশি এই সকল পীড়িতের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের স্বাস্থ্যও পলে পলে ক্ষয় হইতেছে। আরও

দুঃখের বিষয় এই যে, সেবা করিয়া কখনও বা কাহারো মধ্যে বেশ বিরক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। তাহাতে আশ্রমের মূলভাব ও লক্ষ্য হইতে সেবকদিগের দৃষ্টি ক্রমে দূরে যাইয়া পড়িতেছে। অথবা তাঁহারা এমন যন্ত্রবৎ দুর্দ্দমনীয় ভাবে কার্য্য করিতেছেন যে, যেন তাঁহারা ভাব ও উদ্দেশ্যকে ছুঁইতেই পারিতেছেন না! যত তাঁহাদিগের দেহ ও মন কর্ম্মের বিপুল তরঙ্গের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে, ততই যেন তাঁহাদের হৃদয়ের ভাব ও উদ্দেশ্য ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে। ফলে দেখা যাইতেছে যে, কখনও বা সেবক-দিগের কথা এবং আচরণে যেন দম্ভ, অহঙ্কার, কর্ত্তৃত্ব-স্পৃহা, আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি হীন বৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। এই সকল ভাব যদি অধিকাংশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, তবে আশ্রমের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইবে, সন্দেহ নাই! এই সকল ভাবিয়া আমি চিন্তিত হইয়াছি এবং উহার কারণ আমার মনে হইতেছে যে, নিয়মিত কর্ম্মের সঙ্গে আদর্শের চিন্তা বা ধ্যান-ধারণার অভাবেই এইরূপ ঘটিতেছে। কর্ম্মী যদি কর্ত্তৃত্ব-স্পৃহাকে জাগিতে দেয়, তবেই তাহার যথার্থ পতন হইল, বুঝিতে হইবে। তাহা ছাড়া সদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে গিয়া একটা হোঁচোট্ খাইয়া কেহ পড়িয়া গেলেই যে, তাহার আর উঠিয়া কর্ম্ম করিবার যথার্থ অধিকার বা সামর্থ্য থাকিবে না, এ কথাও ঠিক নহে? যদি কর্ম্মীর হৃদয়ে কর্ত্তৃত্বের স্পৃহা আসে

অর্থাৎ আমি কর্ম্ম করিতেছি, অতএব আমার কাছে রোগিগণ এবং অন্যান্য সকলে অনুগত থাকুক, এই প্রকার বাসনা আসে, তাহাহইলেই বিপদ এবং ধ্বংস অনিবার্য্য। কারণ, এখানকার ভাব সেব্য-সেবক বা প্রভু-ভৃত্যভাব। সেবক বা ভৃত্য কখনো সেব্য বা প্রভুর আনুগত্যের দাবী করিতে পারে না। অতএব এই বিপদ হইতে উদ্ধারের পন্থা আমার মনে হইতেছে যে, সেবকগণকে মাঝে মাঝে, অন্ততঃ বৎসরে একমাসকাল কোন স্বাস্থ্যকর স্থান—যেমন হিমালয় প্রভৃতি তীর্থভূমি বা গঙ্গাতীরে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। ঐরূপ স্থানে তাঁহারা যাহাতে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া ধ্যান-ধারণা এবং স্বাস্থ্যোন্নতির সহায়তা প্রাপ্ত হন, তাহা করা উচিত। অতএব এরূপ স্থানে একটি আশ্রম করিতে হইবে, যেখানে সেবকগণ গিয়া উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা লাভ করিতে পারেন।”

চারুচন্দ্রের এই যুক্তিপূর্ণ কথায় এবং উৎসাহে জনৈক সেবক মুগ্ধ হইয়া তৎসাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং তিনি বিন্ধ্যাচল, চুনার, ঝুঁসী, কন্‌খলি, আলমোড়া প্রভৃতি স্থান সমূহে ঐ প্রকার আশ্রমোপযোগী জমির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনোমত স্থান তখনও মিলে নাই। এদিকে সেই সেবক ঐ আশ্রমের জন্য একটি তহবিল করিবার সঙ্কল্প করিয়া, জনে জনে তাহা প্রচার করিতে লাগিলেন।

পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দ স্বামীজী এই সঙ্কল্পের কথা জানিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, এইরূপ সাধন-ভজন করিবার জন্য একটি আশ্রমের আবশ্যকতা আমিও অনেকদিন বোধ করিতেছি এবং মাষ্টার মহাশয়কে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত-প্রণেতাকে) তজ্জন্য লিখিয়াও ছিলাম। তিনি উহার সূচনা করিবার জন্য একটি বাড়ী ভাড়া করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করিতে লেখেন। তাঁহার কথায় কন্‌খলে একটি বাটী ভাড়া করা হইল। উহাতে চারি পাঁচজন থাকিয়া বেশ সাধন-ভজন করিতে লাগিলেন—এই আশ্রমের নাম দিয়াছিলাম "সাধন-কুটীর"। তার পর আমি আলমোড়া চলিয়া গেলাম। কিছুদিন পর যাঁহারা তথায় ভজন করিতেছিলেন, তাঁহারাও অন্যত্র চলিয়া গেলেন। ফলে আশ্রমটি উঠিয়া গেল। উহার বাটীভাড়া মাষ্টার মহাশয় দিতেন। এখন আবার যে চারুবাবু প্রভৃতি তোমরা ঐ উদ্দেশ্যের জন্য চেষ্টা করিতেছ, তাহাতে আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। ঠাকুর তোমাদের চেষ্টার সফলতা নিশ্চয় করিবেন। যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, তোমরা আশ্রম করিতে পার, তবে উহার নাম রাখিও—"সাধন-কুটীর"।

দিন চলিতে লাগিল। চেষ্টাও হইতেছিল। কিন্তু কোথাও মনোমত স্থান মিলিল না। ইতিমধ্যে অল্পে অল্পে ঐ তহবিলে কিছু অর্থও সঞ্চিত হইয়াছিল।

১৩২৫ সালের প্রারম্ভে পূজ্যপাদ সারদানন্দস্বামীজী

কাশীধামে উপস্থিত ছিলেন। তখন পূজনীয় শুভানন্দজীও সেবাশ্রমে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। সেই সময় দেরাদুনের নিকটবর্ত্তী কিষেণপুর নামক পল্লীতে প্রায় চারি বিঘা জমি ও তদুপরি দুইটি বাসোপযোগী বাটী ৪৫০০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয়ার্থ আছে, এই সংবাদ পাওয়া গেল। এই সংবাদ শুনিয়াই শুভানন্দজী উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "এখনই উহা ক্রয় করুন। উত্তরাখণ্ড হিমালয় অতি চমৎকার তপোভূমি। স্বাস্থ্যলাভ এবং সাধন-ভজন দুইই তথায় হইবে।" তাঁহার কথায় সকলেই একমত হইলেন বটে, কিন্তু তখনই টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে, ইহাই হইল সমস্যার কারণ। তখন শুভানন্দজী, অচলানন্দজী, কালিকানন্দ প্রভৃতি চারিজন সেবক পূজ্যপাদ সারদানন্দজীর সমীপে উপস্থিত হইয়া উপরি-উক্ত সকল কথা তাঁহাকে জানাইলেন। সকলের পরামর্শমত ঠিক হইল যে, এখন ঋণ করিয়াই ঐ জমি ও বাড়ী "সাধন-কুটীরের" জন্য ক্রয় করা হউক। উহার কয়েকদিন মধ্যেই ঋণ করিয়া টাকা সংগৃহীত হইল এবং শুভানন্দজী ঐ টাকা লইয়া কিষেণপুরে উক্ত জমি ও বাড়ী ক্রয় করিতে চলিয়া গেলেন।

১৯২৫ সালের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের প্রেসিডেণ্ট এবং সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী ও সারদানন্দজীর নামে ঐ জমি ক্রয় করা হইল। কিছুকাল পরে শুভানন্দজী তথায় তিনচারিজন সেবক লইয়া বাস করিতে লগিলেন।

ধ্যানে, ভজনে, পাঠে এবং দেবতা-দর্শনাদিতে তাঁহাদের দিন আনন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

এইরূপে সেই মহাকর্ম্মী সমস্ত কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া ভাবের মহাসাগরে নিজেকে ভাসাইয়া দিলেন। এই পরম ভাবুকতার শান্তিতে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। এখন কেবলই অন্তরধনের অন্বেষণে তিনি আপন-ভোলা হইয়া গিয়াছেন। কোথায় আর সেই কর্ম্মের চেষ্টা ? আজ শুধু ভাবের ফুল্ল কুসুমরাশি সেই অনন্তের চরণে যেন অঞ্জলিপূর্ণ হইয়া অর্পিত হইতেছে।

এইরূপে শরীর-ভোলা সেই সাধুর দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। মন যতই তাঁহার উড়িয়া চলিল, দেহপিঞ্জর ততই ক্ষীণ হইতে লাগিল। কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি নাই! ভ্রূক্ষেপ নাই! আপন-ভোলা কেবল পরম-আপনের দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছেন। আর প্রাকৃত সবই ভুলিয়া গিয়াছেন।

সেবাশ্রমের সেবকগণ সর্ব্বদা এই আপন-ভোলা সন্ন্যাসীর তত্ত্ব লইয়া চলিতেছেন। কতবার কতরূপে সেবকগণ তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়াছেন—কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। সে যেন একটি পাল-তোলা নৌকা—সমস্ত বাধার ঢেউ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে! সে যেন একটা আগুনের গোলক, —চারিদিকের বিঘ্ন ভস্ম করিয়া দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে! তার তীব্রবেগের লক্ষ্য কোথায়? অপরে তাহা জানে না, বুঝিতেও পারে না; কিন্তু সেবকেরা তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত

হইতে কখনও পরাঙ্মুখ হন নাই। কোন প্রকার ব্যতিক্রম দেখিলেই তাঁহারা অস্থির হইয়া তাঁহাকে কিসে সাহায্য করিতে পারিবেন, সে চেষ্টাই করিতেন। কিন্তু সে অতি কঠিন সন্ন্যাসী; সাহায্য করিবার অবসরও দিতেন না। বুঝি-বা কেবল দেওয়ার জন্যই তিনি জগতে আসিয়াছেন—লওয়ার জন্য নয়। কিন্তু তিনি নিতে না চাহিলে কি হইবে? বিধাতা করিলেন অন্যরূপ। শুভানন্দজী বুঝিলেন, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। সেবক বন্ধুদের সাহায্য করিতে দেখিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, বোধ হয় তিনি অসুস্থ। তখন তিনি কিষেণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধন-কুটীরে। সেবক—সন্ন্যাসী বন্ধুগণ তাঁহাকে অতি যত্নে তথায় রাখিয়াছেন এবং যতদূর সম্ভব, তাঁহার সেবার আয়োজন করিয়াছেন। কিন্তু দিনে দিনে তাঁহার স্বাস্থ্য অধিক নষ্ট হইতেছে দেখিয়া সেবকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং অতি শীঘ্র তাঁহাকে ৺কাশীধামে আনয়ন করিলেন।

শুভানন্দজী ভগ্নদেহে ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিলেন যে, "হায়! আমি যে সেবক,—আমার সেবা কেহ করিবে, এমন কেন হইল?" তিনি আজ তাঁহার এই সেবার আয়োজন দেখিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং প্রায়ই বলিতেন এ কি হইল? এই অকর্ম্মণ্য দেহকে অপরের সেবার অধীন করিয়া এখনও বহিতে হইবে? এ বহন বড়ই দুর্ভার বহন! তিনি সেবকগণকে সেবা করিতে নিষেধ করিয়া কার্য্যতঃ

আরও দৃঢ় হইলেন। কিন্তু, তবু সেবকেরা আজ তাঁহার কথা অমান্য করিল। যাঁহার কাছে তাঁহারা সেবার মন্ত্র শিখিয়াছেন, আজ তাঁহাকে সেই মন্ত্রে সেবার অঞ্জলি দিবেন না তো দিবেন কাহাকে? কিন্তু অপরদিকে স্বামী শুভানন্দ—সমস্ত জীবন যিনি কেবলই পূজা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার অন্তরে পূজা লইবার স্থান কোথাও তো ছিল না। সেই তপঃপূত সমুজ্জ্বল হৃদয় মধ্যে কোন তামসী বৃত্তির চিহ্নমাত্রও নাই। সেই শুদ্ধ নির্ম্মল মানস-সমুদ্রে কেবলই নরনারায়ণের অর্চ্চনার জন্য অনন্ত ভাব-তরঙ্গমালা অনুক্ষণ সমুদ্বেলিত হইয়া বিরাজমান ছিল, কিন্তু পাছে তাঁহার সহকারী সেবক বন্ধুগণ ক্ষুণ্ণ হন, এজন্য নিতান্ত আবশ্যক সেবা তিনি যেন তাঁহাদের আব্দারটুকুর ন্যায় গ্রহণ করিতেন—তাহার অতিরিক্ত একটুকুও নয়।

এই সময়ে ১৯২৬ সালের এপ্রেল মাসে বেলুড়মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কন্‌ভেন্‌শনের অধিবেশন হয়। এই সম্মেলনে উপস্থিত হইবার জন্য পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দজী তাঁহাকে আহ্বান করেন এবং কলিকাতা হইতে তাঁহাকে একবার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বায়ুপরিবর্ত্তনার্থে ৺ পুরীধামে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। শুভানন্দজী এই পত্র পাইলেন এবং উহা পাঠ করিয়া, পত্রখানি মস্তকে রাখিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া অবশেষে সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়া নীরব রহিলেন। কিছুতেই

তাঁহার মন আর কাশী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে চাহিতেছিল না;—তজ্জন্যই তিনি তাহাতে অসম্মতি জানাইয়া নীরব রহিলেন।

ইত্যবসরে স্বামী কালিকানন্দজী প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট সেবক আসিয়া তাঁহাকে আবার বিশেষরূপে জেদ করিয়া ধরিলেন। কিছুতেই তাঁহারা তাঁহাকে সঙ্গে না লইয়া বেলুড় মঠে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন না। তখন সকলের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া শুভানন্দজী বলিলেন, "নিতান্তই যদি আপনারা যাইতে বলেন, তবে অগত্যা যাইব।" তখন উৎসাহের সহিত স্বামী কালিকানন্দজী তাঁহার মঠে যাইবার দিন ধার্য্য করিয়া একটু পূর্ব্বেই প্রয়োজন-বশতঃ কলিকাতায় রওয়ানা হইলেন এবং দিনকয়েক পরে অপর একজন সন্ন্যাসী সেবক তাঁহাকে মঠে লইয়া যাইবার জন্য সকল ব্যবস্থা করিলেন।

ক্রমে বেলুড় মঠে যাত্রার দিন উপস্থিত হইল। তৈজসপত্র যাহা কিছু আবশ্যক, তাহাও গাড়ীতে উঠান হইল, কিন্তু তখনও তাঁহার হৃদয় বারাণসী ত্যাগ করিতে চাহিতেছে না। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার অনিচ্ছা জানাইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে গৃহমধ্যে অন্যমনস্কভাবে পাদচারণ করিতে করিতে অস্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন,—"না, আমি যাইব না, তোমরা আমায় নিয়ে যেও না, আমার শরীর চল্‌ছে না, আমার মনও যাইতে চাহে না—যাইব না আমি।"

যেমন মায়ের কোল হইতে শিশুকে টানিয়া লইতে গেলে শিশু কেবলই অনিচ্ছা প্রকাশ করে এবং নানাপ্রকার বাহানা করে, ঠিক যেন সেই গৌর-সন্ন্যাসী অবিকল শিশুর মত কেবলই নিষেধ জানাইতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, —"এই যে আমার শরীর, এ আর বেশী দিন থাক্‌বে না সুতরাং ইহা এইখানেই থাকুক—বিশ্বময়ীর চরণমূল হইতে আর ইহাকে তোমরা ছিনাইও না!" ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি গদ্‌গদভাবে আবিষ্ট হইয়া রহিলেন। সেবকগণ এ দৃশ্য দেখিয়া এবং এ করুণ স্বর শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। আর কাহারও মুখে কথা ফুটিল না,—শুভানন্দজীর বিছানাপত্র গাড়ী হইতে অগত্যা নামাইয়া লওয়া হইল, যাওয়াও স্থগিত রহিল।

যিনি শুভানন্দজীকে মঠে লইয়া যাইবেন বলিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন, চিন্তাকুল ভাবে নিরুৎসাহ হইয়া সেই দিনই তিনি একাকী বেলুড়ে যাত্রা করিলেন। কারণ কন্‌ভেন্‌শনে উপস্থিত হওয়া তাঁহার একান্ত প্রয়োজন ছিল। বেলুড়ে পৌঁছিয়া যখন তিনি স্বামী সারদানন্দজীকে সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন, তখন পূজনীয় স্বামীজীও চিন্তামগ্ন হইয়া বলিলেন, "অতিরিক্ত কঠোরতায় শুভানন্দের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে—বুঝিতে পারিতেছি। কোন একটু স্নিগ্ধস্থানে যাওয়া আবশ্যক। তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইলে কাশীর বাহিরে কোথাও পাঠান উচিত। বারাণসীতে এখন খুবই গরম পড়িয়াছে,

আরও গরম পড়িবে, আমি তাহাকে চিঠি লিখিতেছি।” তাহার পরদিনই ডাকে পূজনীয় সারদানন্দজী শুভানন্দজীকে এক বিস্তৃত পত্র লিখিলেন এবং একজন সেবককে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে কন্‌খল সেবাশ্রমে শীঘ্র যাত্রা করিতে অনুরোধ করিলেন। সেইদিনই কন্‌খল সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কল্যাণানন্দজীকেও পৃথক্ পত্রে শুভানন্দজীর জন্য তথায় সুব্যবস্থা করিতে লিখিলেন।

শুভানন্দজীর নিকট যখন সেই পত্রখানি উপস্থিত হইল, তখন তিনি তাহা পাঠ করিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিলেন, পরে পত্রখানিকে মস্তকে স্থাপন করিয়া সম্মুখস্থ প্রকৃতির উজ্জ্বল দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টিস্থাপনপূর্ব্বক মৃদু হাস্যের সহিত একজন সেবক সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,“আমি মনে করিয়াছিলাম এই নশ্বর শরীরটা কাশীর গঙ্গায় পড়িবে। কিন্তু এখন বুঝিলাম, বিশ্বনাথের অভিপ্রায় অন্যরূপ;—যাক্ শরীরটা কন্‌খলেই যাক্।” এই বলিয়া যে শুভানন্দজী—যিনি বহুপ্রকার অনুরোধসত্ত্বেও সেদিন বারাণসীর সীমার বাহিরে যান নাই, তিনিই আজ পূজনীয় সারদানন্দজীর আদেশপালনার্থে সেই মুহূর্ত্তে দূর কন্‌খলে যাইতে সম্মত হইয়া, সত্বর তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

দুই দিন মধ্যেই আবার আশ্রমের দুয়ারে গাড়ীখানি আসিয়া লাগিল এবং শুভানন্দজী আশ্রমের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সেবার জন্য স্বামী চৈতন্যানন্দ

সঙ্গী হইলেন। সমস্ত সেবক সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু তিনি জনে জনে প্রত্যেকের কাছে এবং নিকটস্থ সুহৃদ্‌বন্ধু যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের সকলের কাছে এবং যেন আশ্রমের তৃণ ও ধূলির কাছেও প্রাণ ভরিয়া বিদায় লইলেন। সকলকে আলিঙ্গন দিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ীতে বসিবার সময় স্বামী অমরানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "আমি যাইতেছি—বোধ হয় আর ফিরিব না, তোমাদিগকে একটি কাজের ভার দিয়া যাইতেছি—পোষ্ট অফিসে যে কিছু সামান্য অর্থ আমার আছে, যখন শুনিবে, আমার শরীর আর এ জগতে নাই, তখন উহা দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ভোগরাগ দিয়া সাধুদিগকে ভাণ্ডারা দিও এবং দরিদ্র নারায়ণের সেবায় সমস্ত ব্যয় করিয়া দিও।" এই বলিয়া তিনি বারাণসী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যতক্ষণ বারাণসী দেখা যাইতে লাগিল, তিনি সমস্ত প্রাণ-মনে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে আপন প্রণাম জানাইয়া, যেন সমস্ত মায়ার বন্ধন কাটাইয়া নিরুদ্দেশ যাত্রীর মত চলিয়া গেলেন! পার্থিব আকর্ষণ আর তাঁহাকে আট্‌কাইয়া রাখিতে পারিল না।

সেবাশ্রম আজ যেন প্রবাসগামী পুত্রের জননীর মত ব্যথাভরা বুকে গভীর আবেশে শূন্যময় হইয়া পড়িয়া রহিল—আর তাহার প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে দীন-দুঃখী যাহারা ছিল, আজ তাহাদের নয়নাশ্রু তাহাদের প্রাণপ্রিয় সুহৃদ্‌কে বিদায় দিতে কেমন করিয়া ঝরিতেছিল—তাহা লিখিয়া কে জানাইতে পারে?

ত্রিংশ অধ্যায়।

হিমগিরির স্নিগ্ধ বাতাস কন্‌খলের সমস্ত প্রকৃতিকে যেন কোন্ স্নেহের ভাষায় অন্তরের কথা শুনাইতেছিল। কাশী ত্যাগ করিয়া আসার যে অনিচ্ছা শুভানন্দজীর হৃদয়ে ছিল, আজ এই শীতল বাতাসের স্পর্শে এবং জাহ্নবীর কুলুকুলু ধ্বনিতে এই ক'দিনেই তাহা যেন একেবারে দূর হইয়া গিয়াছে। বারাণসীর আর এক প্রভাতে সেই বিদায়-কালীন তমসাচ্ছন্ন ভাবের কথা হয়ত অস্পষ্ট তাঁহার মনে পড়িতেছিল, কিন্তু আজ বৈশাখের প্রথম দিনে কন্‌খলের প্রভাত-বায়ুর কোন্ উচ্চতর সুরের মূর্চ্ছনায় সে স্মৃতিও যেন তিনি ভুলিয়া যাইতেছিলেন। স্তরের পর স্তর ঠেলিয়া মুক্ত বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য-করোজ্জ্বল পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর দিয়া, আরও উপরে, ধাপের পর ধাপে মন যেন তাঁহার কোন্ অসীম রাজ্যে উধাও হইয়া যাইতেছিল! রজনীর অবসানে, প্রকৃতির কি মুক্ত সৌন্দর্য্য, কি প্রমুক্ত মন, কি বিমুক্ত দেহভার, যেন আজ আর তাঁহার রোগ নাই, কোনই ব্যথা নাই। তাঁহার হৃদয়-বীণাখানি কোন্ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-সুরে কেবলই যেন বাজিয়া উঠিতেছে। আজ প্রকৃতির সমস্ত পদার্থেরই মধ্যে—এমন কি একটি তৃণ-পত্রের আন্দোলনেও যেন তাঁহার মনঃপ্রাণ কোন্ এক

স্বামী শুভানন্দ (চারুবাবু)

আনন্দ-বাণী শ্রবণ করিতেছে। অহো! আজ যেন তাঁহার মুক্তানন্দবিধৌত প্রাণ, প্রভাতের অমল-ধবল সায়রে প্রফুল্ল কমলের মত ভাসিয়া উঠিয়াছে। এসো, এসো হে, আমার চির-প্রিয়তম! যে আলিঙ্গন এতদিন বিশ্বের সঙ্গে ছিল, সে আলিঙ্গন আজ তোমারই সাথে। শূন্যদৃষ্টিবদ্ধ শুভানন্দজী গৃহের বাহির হইয়া অনির্দ্দেশ্য ভাবে কোন্ দিকে চলিতেছেন তাহা তিনি জানেন না—কেহই জানে না; কেবল তাঁহার সঙ্গী ও সেবক চৈতন্যানন্দ ভোর হইতে এই ভাবমগ্নপ্রাণ যোগীকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। এই ভাবে তাঁহাকে চলিতে দেখিয়া ত্রস্ত-পদে এবং তাঁহার ভাবভঙ্গ না করিয়া পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন।

শুভানন্দজী চলিতে লাগিলেন। দ্রুতগামিনী জাহ্নবীর তীরে তীরে তিনি সেইরূপ তন্ময় ভাবেই হরিদ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিতে লাগিলেন। আর অন্য দিক্‌বিদিক জ্ঞান নাই, অন্য কোন দিকে মন নাই। শুধু যেমন করিয়া বৃক্ষলতা কেবল আলোর দিকেই আপনার সমস্ত প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অগ্রসর করিয়া দিয়া চলিয়া থাকে, তিনি তেমনই করিয়া চলিতে লাগিলেন। চারিদিকের বৃক্ষলতাও যেন চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কে এ মহাযোগী! কোথায় চলিয়াছেন? অতি সন্তর্পণে চৈতন্যানন্দ তাঁহার পিছু পিছু চলিতেছেন; কিন্তু তাঁহাকে ডাকিবার বা একটি কথা উচ্চারণ করিবার শক্তি তিনি খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না।

সহসা শুভানন্দজী তাঁহার গতি পরিবর্ত্তন করিলেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া একটু থামিয়া যেদিকে কল্ কল্ গঙ্গার জল শিলাতটে নৃত্য করিতে করিতে হিমারণ্য বিধৌত করিয়া সেই অকাশস্পর্শী জগৎ হইতে সাগর উদ্দেশ্যে ছুটিয়া চলিতেছিল, তিনি সেই দিকে চলিতে লাগিলেন। যেখানে সেগুন, শিশু ও দেবদারু পাদমূলে একটি বাঁধান ঘাট পথিকের মন হরণ করিয়া হৃদয় বিস্তৃত করিয়া দিয়া আছে, তিনি সেইখানে ধীরে ধীরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। উপরে বৃক্ষশাখায় পাখীর কলগান বাতাসে ভাসিয়া চলিয়া যাইতেছে—সেদিকেও শ্রবণ আছে কি না, কে জানে? অথবা সে সঙ্গীতের সুরের মধ্যে তিনি কি শুনিতেছিলেন তাই-ই বা কে জানে? অল্পক্ষণ পরে ধীরে ধীরে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া পাদুকা ও উত্তরীয় ঘাটের ধাপে রাখিয়া করজোড়ে গঙ্গার জলমধ্যে অবতরণ করিতে লাগিলেন। গঙ্গার শীতল স্পর্শে তাঁহার শরীর যেন প্রফুল্ল হইয়া শিহরিয়া উঠিতেছিল। সেই অমলধবল জল, সেই কল কল নাদ, তাঁহার নয়নে ও শ্রবণে যেন ত্রিদিবের আলোকময় রাজ্য আনিয়া দিতেছিল। তিনি একবার প্রায় নাভিমূল পর্য্যন্ত গঙ্গায় অবতরণ করিতেছেন, আবার উঠিয়া আসিতেছিলেন! চৈতন্যানন্দ তখন সোপানোপরি দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি শুভানন্দজীর সঙ্গে সঙ্গে কয়েক সোপান অবতরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ

করিতে দেখিয়া চৈতন্যানন্দ প্রথমে কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি স্নান করিবেন?" অতি মৃদুস্বরে উত্তর হইল, "না"। তখন চৈতন্যানন্দ ভাবিলেন, তিনি তৈল মাখিয়া থাকেন, কিন্তু আজ দেখিতেছি, তাঁহার তৈলমাখা হইল না; যাহা হউক জলে যখন নামিয়াছেন, স্নান করিবেন নিশ্চয়, স্নানান্তে তাঁহার বস্ত্রের প্রয়োজন হইবে; তিনি স্নান করিতে থাকুন্, ততক্ষণে আমি বস্ত্র লইয়া আসি। ইহা মনে করিয়া চৈতন্যানন্দ সত্বরপদে আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

সুদূর আকাশে বলাকার ঝাঁক সোঁ সোঁ করিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। বহুদূরে মেঘস্তরের মধ্যে তাহারা শ্বেত-বিন্দুবৎ মিলাইয়া গেল। ততক্ষণে চৈতন্যানন্দ আশ্রম হইতে শুভানন্দজীর বস্ত্রাদিসহ দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসিয়াছেন, কিন্তু ঘাটে পৌঁছিয়াই তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন! এ কি! কোথায় শুভানন্দজী! তাঁহার পাদুকা ও উত্তরীয় পড়িয়া রহিয়াছে! তাই তো; ঘাটে তো তাঁহাকে দেখিতেছি না। একবার উচ্চৈঃস্বরে তিনি শুভানন্দজীকে ডাকিলেন, কিন্তু হায়, গঙ্গার অপরতীর তাঁহাকে আজ বিদ্রূপ করিয়া প্রতিধ্বনি জানাইল! চৈতন্যানন্দের চমক ভাঙ্গিল। উচ্ছ্বসিত জাহ্নবীর জলাবর্ত্ত কলধ্বনি করিয়া তাঁহার প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে ছুটিতেছে। তখন সেখানে আর একটিও জনমনুষ্য ছিল না। কোথায় তিনি? চতুর্দ্দিকে

চাহিয়া চৈতন্যানন্দ কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল—শুভানন্দজী সাঁতার জানেন না। চৈতন্যানন্দের শরীর শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা সংযত করিয়া, তিনি আর মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব না করিয়া, গঙ্গাজলের খরস্রোতের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া তীরে তীরে ছুটিতে লাগিলেন। এক একবার তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় হৃদয় স্তব্ধ হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সমস্ত আবেগ সম্বরণ করিয়া তিনি ঐ ভাবে ছুটিয়া চলিলেন। যেখানে গঙ্গার সেই ধারা আর একটি খালের সঙ্গে মিলিয়াছে, সেইখানে আসিয়া দেখিলেন, কয়েকজন সাধু গঙ্গাবগাহন করিতেছেন। ব্যগ্র হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন একজন সাধুকে কি এদিকে ভাসিয়া আসিতে দেখিয়াছেন?" তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উত্তর করিলেন,—"হাঁ, হাঁ—গৈরিক-পরিহিত একটি বাঙ্গালী সাধু ভাসিয়া আসিয়া এইখানে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন; আমরা তাঁহাকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া দেখিলাম, তখনও তাঁহার দেহে প্রাণ আছে—আমরা এইমাত্র তাঁহাকে বাঙ্গালী হাঁসপাতাল সেবাশ্রমে প্রেরণ করিয়াছি। চারিজন সাধু তাঁহাকে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন।" এই সংবাদ শুনিবামাত্র চৈতন্যানন্দের মন বিভ্রান্ত হইয়া যাইতেছিল। তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে আশ্রমাভিমুখে ছুটিলেন, তথায় গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর তাঁহার দুঃখ ও ক্ষোভের

পরিসীমা রহিল না। দেখিলেন, জনৈক ডাক্তার এবং আশ্রমস্থ সেবকগণ স্বামী শুভানন্দজীর শুশ্রূষা করিতেছেন। চৈতন্যানন্দ ভিড় ঠেলিয়া শুভানন্দজীর দেহের নিকটবর্ত্তী হইলেন; কিন্তু তাঁহার দেহের কাছে গেলে আর কি হইবে! সকল সেবা, সকল শুশ্রূষা ও চিকিৎসা সকলই বিফল হইয়া গিয়াছে। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর সলিলে নশ্বর ভঙ্গুর দেহ ঢালিয়া দিয়া শ্রীমৎ শুভানন্দজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লোকে মহা-প্রস্থান করিয়াছেন।

এমন বিসর্জ্জনের দৃশ্যে চৈতন্যানন্দের সমস্ত মনঃপ্রাণ মর্ম্মান্তিক বিষাদে ভরিয়া গেল। তাঁহারা সকলে থাকিতে, যে তাঁহারা সেবা করিতে পারেন নাই এবং শেষ সময়ের এ অবস্থায়ও যে তিনি উপস্থিত এত লোকের সেবা কিছুই গ্রহণ করিলেন না—ইহাও পরম দুঃখের বিষয়। যেন মহাসেবাময় মূর্ত্তি তিনি স্বয়ং সমস্ত জীবন সেবায় তন্ময় থাকিয়া নিজের জন্য একবিন্দু সেবার অবসর কাহাকেও দিলেন না! কে আছ এমন ত্যাগী, কে আছ জগতে এমন সেবক, যিনি সেবার জন্য আসিয়াছিলেন, কিন্তু একটি দিনও সেবিত হন নাই। যেন সেবাধর্ম্মই তাঁহার জীবনের মধ্য দিয়া আপনি ধন্য হইয়াছে; এই মহান্ জীবনের কথা ভাবিতে ভাবিতে চৈতন্যানন্দের শুষ্ক নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন—যাও মহাপুরুষ, তুমি জ্যোতির্ম্ময় অন্তহীন সেই অমরলোকে।

তুমি তো কখনও কিছু চাহ নাই, আর কখনও চাহিবে না। কিন্তু আমরা চাহিব—তোমার জীবনের নির্ম্মল মধুর সুন্দর আদর্শ। তোমার মর্ম্মস্পর্শী কর্ম্মের কথা, ত্যাগের অমৃতময় আখ্যান; তুমি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবকদের প্রাণের পরতে পরতে এবং কালের পাতায় পাতায় জাগিয়া রহিবে। তুমি যাও, কিন্তু তুমি তো কাহারও হৃদয় হইতে যাইতে পারিবে না। তোমার অদর্শনে দিন যাইবে, কিন্তু তুমি দিনে দিনে আমাদের চিত্তে আবার শত সহস্র লক্ষ লক্ষ হইয়া জাগিয়া উঠিবে। তোমার যে সেবা, তোমার যে কর্ম্ম, তোমার যে ত্যাগ, তাহা মানুষকে অনাবিল উৎসাহে উৎসাহিত করিয়াছে এবং আনন্দ ও মহত্ত্ব দিয়াছে; দুঃখীর দুঃখের মধ্যে মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ-নির্ঝরিণীর মত শান্তি দিয়াছে—সেই তুমি কোথায় যাইবে? লক্ষ স্বর্গলোকের পারে যাও কিন্তু এই মর্ত্তের মানুষ তোমাকে ভুলিবে না। এমন কোন স্বর্গ নাই যে, তোমার স্মৃতি পৃথিবীর বুক হইতে মুছাইতে পারে। তুমি স্বর্গ হইতেও গরীয়ান্ হইয়া লোকের চিত্তে বিরাজ করিবে। "জগৎ গুরুর উপদেশ সেবা স্বর্গাধিক স্বর্গ"—সেই সেবাকে তুমি মূর্ত্তিমতী করিয়া ধরণীতে আনিয়াছ—তুমি কি মানুষ! যদি মানুষ হও, তবে আশীর্ব্বাদ করিও, যেন তোমার মত মানুষে পৃথিবী ভরিয়া যায়। এই ভাবে কেহ কেহ নীরবে, কেহ কেহ বা পরস্পরে শুভানন্দজীর জীবন-গাথা আলোচনা করিতে করিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জয়ধ্বনিতে কনখলের দিঙ্মণ্ডল,

কম্পিত করিয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"কে আছ সেবক এসো,—আমরা এই মহাসাধুর দেহ আবার গঙ্গার জলে দিয়া পবিত্র হই।"

সুদূরে গঙ্গামাতা বুক পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে প্রদত্ত সেই দেহ যেন তিনি ঠিক মায়েরই মত উল্লাসে আবার গ্রহণ করিয়া আপন বুকে লুকাইয়া ফেলিলেন। শুভানন্দজীর দেহোৎসর্গের বার্ত্তা তড়িৎগতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সকল কেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িল। সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই জানিতে পারিলেন—তাঁহাদের একজন তপনসদৃশ দীপ্তকর্ম্মী আজ পয়লা বৈশাখ (১৩৩৩ সাল) অস্তমিত হইলেন' সকলে ব্যথায় ও দুঃখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

আজ অনেক দিনের অনেক কথা মনে পড়িতেছে। এক দিন নয়, অনেক দিন—তিনি আমাদেরই কাছে বলিয়া ছিলেন যে, "যখন এই দেহ জড়ত্ব ও জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়—অপরের সেবায় আর তাহার শক্তি থাকে না, তখন সে দেহ পৃথিবীতে রাখিয়া কি আর লাভ; যে জন প্রকৃত কর্ম্মী, সে যখন বুঝিতে পারিবে যে, তাহার শরীর কর্ম্মের অবসান চাহিতেছে—তখন জননী সর্ব্বশান্তিময়ী জাহ্নবীর পবিত্র জলেই সেই ব্যর্থ দেহের পতনই তো তার পক্ষে পরম মঙ্গল। সেই বিসর্জ্জনে যে আনন্দের অর্জ্জন হয়—দেহভার বৃদ্ধি করিয়া কোথায় সে আনন্দ পাওয়া যাইবে?

এই শরীর দিয়া নারায়ণের সেবা করিব, এই তো আমার কামনা, জগতের কেহ আমার ভগ্ন দেহের সেবা করিবে, এ ধারণা করিতেও হৃদয় শিহরিয়া উঠে। যদি বল, সে বিসর্জ্জন আত্মহত্যার তুল্য, কিন্তু যে শরীরে আর আমি নাই, সে শরীর-মধ্যে আত্মাকে আবার আনিয়া বদ্ধ করার চেষ্টাই বরং আত্মহত্যা। যে আত্মা অকর্ম্মণ্য শরীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত, তাঁহাকে অনন্তের পথে যাইতে দেওয়াই ভাল, না, কর্ম্মহীন পথে টানিয়া রাখা ভাল? যেদিন দেখিব, "তাঁহার" এই দেহের উপরে "তাঁহারই" ইচ্ছা যে আর কর্ম্মের বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে না, তখন, যিনি কর্ম্মকে তাঁহার নিজের মধ্যে লইয়া গিয়াছেন, তাঁহারই ক্রোড়ে তাঁহার দেহকেও সমর্পণ করাই তো ভাল। তাহাতেই কর্ম্মের শান্তি, দেহের শান্তি, বিশ্বের শান্তি!"

এই সকল কথা বলিতে বলিতে কোন কোন দিন শুভানন্দজীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কখন বা তিনি বলিতেন, "যেমন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব জ্যোৎস্না-সমুদ্ভাসিত সমুদ্রে আপন জীবন মিশাইয়া দিয়াছিলেন, যেমন করিয়া তাঁহার শিষ্য ভক্তবীর ঠাকুর নরোত্তম দাস জাহ্নবীজলে দেহটি সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন, যেমন করিয়া মহাযোগী পাওহারী বাবা আপন শরীরটিকে হোমাগ্নিতে আহুতি দিয়া-ছিলেন, তেমনি করিয়া দেহত্যাগই তো অমৃতত্ব। যাঁহারা

ত্যাগের মন্ত্রে জীবনকে অমৃতময় করিয়াছেন 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ' এই মন্ত্র যাঁহাদের হৃদয়-বীণায় অহরহ বাজিয়া চলিতেছে—মাত্র দেওয়ার আনন্দই তাঁহাদেরই জীবনের সার। যে দেহ আর কাহাকেও কিছু দিতে পারিবে না, সে দেহটিকে দিয়ে দেওয়াই ত শ্রেয়ঃ”—এই সকল কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডলে দিব্যভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। তখন আমরা তাঁহার ঐ সকল কথার মর্ম্ম সম্যক্ বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আজ আমরা দেখিয়া বুঝিলাম, সেই শুদ্ধদাতা, সেই সেবা-তন্ময় পুরুষ, সেই সর্ব্বত্যাগী মহাকর্ম্মী এবং সেই আনন্দময় মহাসাধক জীবন ভরিয়া শুধু দিয়াছেন—কেবল দিয়াছেন—সমস্ত দিয়া তিনি জগতে অন্তহীন হইয়া আপনাকে অনন্তের মধ্যে বিলাইয়া দিয়াছেন।

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

"প্রাণান্ত এ দক্ষিণান্ত কর্ম্মফল মা তুই সকলি,
মায়ের ছেলে প্রেমিক এখন, যার কাছে কাল কৃতাঞ্জলি।"

শুভানন্দজী এইরূপে তাঁহার সেবা-যজ্ঞের দক্ষিণান্ত করিলেন। হয়ত তখন তাঁহার হৃদয়-যন্ত্র হইতে আচার্য্য দেব স্বামীজীর নির্ভীক গম্ভীর বাণী সকল বাহির হইয়া আসিতেছিল, হয়ত তিনি দশদিক্‌ময় শুনিতে পাইতেছিলেন, ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আশীষ্-মাখান ত্রিদিবের আহ্বান। হয়ত তখন সেই বাণী তাঁহার মরমে পশিয়া তাঁহাকে সমস্ত জগতের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে।

এই বিশ্ব "তিনি", তুমি "তিনি", আমিও "তিনি", রোগ, শোক, ব্যথা "তাঁহারই" বিভূতি ;—কর্ম্ম "তাঁর" ;—"তাঁহারই" ধর্ম্ম—"তিনি"ই জগৎ ;—"তিনি" মাতৃস্বরূপিণী ;—"তিনি"ই সুহৃদ্‌রূপী ;—"তিনি"ই বিশ্বস্বরূপ ;—"তিনি" সমস্তের মধ্যে অনুস্যূত ;—বিন্দুতে বিন্দুতে "তাঁহা"রই ছায়া ;—"তাঁহা"রই উচ্ছ্বাস আনন্দ, "তিনি"ই কর্ম্মের অবসর, জ্ঞানের আকর, সত্যের স্বরূপ, সেবার শাশ্বত নিকেতন তিনিই সেই—"করণং কারণং কর্ত্তা বিকর্ত্তাগহনো গুহঃ"—

ওঁ শান্তি ! ওঁ শান্তি !! ওঁ শান্তি !!!

উপসংহার।

ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, যাঁহারা অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছুক—অর্থাৎ ভগবান্‌কে যাঁহারা আপনার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া তাঁহাতেই মিলিত হইতে অভিলাষী, লোকের সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে বনে যাইতে হইবে। সংসারের ভক্তি, ভালবাসা ও স্নেহ-সহানুভূতি প্রভৃতি কোমল-বৃত্তিগুলিকে একেবারে মন হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহাদের হৃদয়কে অতি নীরস শুষ্কভাবে গড়িয়া লইতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে সেই আত্মস্বরূপকে লাভ করিতে গিয়া তাঁহাদের মন যে ভাবে প্রস্তুত হয়, তাহা আর এক প্রকারের। তাঁহাদের সেই হৃদয়কন্দরে পরব্রহ্ম ব্যতিরেকে কোন বস্তুই প্রকাশিত হয় না। নির্ব্বিশেষ একমাত্র ব্রহ্ম, যিনি জগতের আর সমুদয় হইতে সম্পূর্ণ প্রকারে বিভিন্ন; কেবলমাত্র তাঁহারই জন্য সেই হৃদয়-কন্দর উন্মুক্ত থাকে। জগৎ-সংসার এবং তাহার অন্তঃপাতী সাধারণতঃ প্রত্যেক লোককেই সাধন-পথের বিরোধী মনে করিয়া, তাঁহাদিগকে প্রাপঞ্চিক সকল বস্তু হইতেই দূরে দূরে থাকিতে হয়। এইরূপ করার চেষ্টায় কোন কোন স্থলে জগৎ-সংসারের সকলের উপরে ঘৃণার উদয় হওয়াতে সাধকের বিপথে যাইবার একটি

সম্ভাবনার সূত্রও এপক্ষে রহিয়াছে। অবশ্য, যাঁহারা ক্ষমতায় অতি-শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা সেই বিপথকে অতিক্রম করিয়া আনন্দময় ভাবকে হৃদয়ে কখনও আনিতে পারেন। কিন্তু এইপ্রকার সাধক সংখ্যায় অতি-বিরল। কারণ, জগতে সব মানুষের ক্ষমতা সমান নয়। ধর্ম্ম এবং সাধনা কেবলই শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিদিগের জন্যই নহে। নিম্নস্তরের মানবসাধারণকেও তো সিঁড়ি বহিয়া ক্রমে আলোর রাজ্যের পথে উঠিতে হইবে। শ্রীমৎ আচার্য্য বিবেকানন্দজী সর্ব্বসাধারণের সেই পথটির দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব গঙ্গার স্রোতের মত সেই পর্ব্বত-বনের শুষ্ক বেদান্তকে ঘরে ঘরে আনিয়া দিয়া সংসারের সকল কাজেই উহাকে অবলম্বন করিবার অনুকূল অভিনব ঊষার আলোক প্রদান করিয়াছেন। যাঁহারা বলবান্, তাঁহারা আপন বলে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া যান; কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বল অথচ মুক্তিকামী, তাঁহারা সেই গঙ্গার অমৃতধারায় অবগাহন করিয়াই মুক্তিকে লাভ করিয়া থাকেন। বেদান্তকে সেই গঙ্গার জলের মত সহজপ্রাপ্য যিনি করিয়াছেন, এ নবযুগের প্রভাতে সেই আনন্দময় দেবের পুণ্যরশ্মি "লীলাপ্রসঙ্গ" তাঁহারই অমৃতবাণী জগতে প্রচার করিতেছে। এই অভিনব ভাবই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ শিক্ষার বিশেষত্ব। মানুষ নিত্য যাহা করিতেছে, সেই কাজ যাহাই হউক, তাহার বিচার করিবার কর্ত্তা জগতের কেহ নহেন, কেবল অকপট ভাবে সেই মানুষকে সর্ব্বাগ্রে এই কথা

বিশ্বাস এবং ধারণা করিতেই হইবে যে, ঈশ্বরই জীব এবং তিনিই এই জীবজগৎরূপে সবার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। মানব জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যাঁহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাঁহাদিগকে ভালবাসিতেছে এবং শ্রদ্ধা, সম্মান, প্রীতি, স্নেহ প্রভৃতি যাঁহাদিগের প্রতি ঢালিতেছে, তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরের অংশ, সকলেই "তিনি";—তিনিই আত্মা বা ব্রহ্ম।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য যে "শিবোঽহং" বলিয়াছেন—সেও সর্ব্বজীবকে এইরূপ ব্রহ্ম বা শিব জ্ঞান করিয়া। যেমন আমার ভিতরে আত্মা রহিয়াছেন, তেম্নি সকলের ভিতরেই আত্মা বিরাজিত;—এই সকল খণ্ড খণ্ড বা অংশরূপ জীবাত্মা ইক পরমাত্মারই অংশসমূহ; একটি নদীর জলে অনেকগুলি কলসী ডুবাইলে নদীর জল এবং কলসীর জল যেমন এক—ইহাও যেন সেইরূপ; সর্ব্বত্র একই জলের মত, সর্ব্বত্র একই 'ব্রহ্ম' বা একই 'শিব' সকলের মধ্যেই প্রবিষ্ট রহিয়াছেন। যেন তিনি ভিতরকার আলোর মত সকল বিচিত্রতারই দ্রষ্টা। এহা যদি লোকে ধারণা করিতে পারে এবং উপলব্ধি করিতে পারে অর্থাৎ আপনি যেমন আত্মা, শিব বা নারায়ণ, সেইরূপ সংসারের সকলকেই মানুষ যদি এইরূপ শিব বা নারায়ণ জ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আর আপনাকে ভিন্ন করিয়া বড় ভাবিয়া মানুষ কোনরূপ অহমিকার বশীভূত হইবার অবসর পায় না; এবং এইরূপ বুদ্ধি একবার জন্মিলে

আর তখন অপরের প্রতি ক্রোধ, দ্বেষ, দম্ভ এবং এমন কি দয়া করিবার স্পর্দ্ধা টুকু পর্য্যন্ত, আর তাহার মনেই আসিতে পারে না। এইরূপে 'অহং'-শূন্য হইয়া সে মানুষ অচিরেই আপনাকে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব, চিদানন্দময় ব্রহ্ম বলিয়া সহজে ধারণা করিতে সমর্থ হইতে পারে। এইটি অবশ্য "জ্ঞান" বা "জ্ঞানী"দিগের কথা; "ভক্ত" বা "ভক্তির" দিকের কথা এই যে, ঠিক ঐরূপ ভাবে যতদিন না সর্ব্বভূতেই প্রহ্লাদের মত আপনার ইষ্ট ভগবানকে 'ভক্ত' দেখিতে পাইতেছেন— ততদিন তাঁহার যথার্থ 'ভক্তি' বা 'পরা'ভক্তি কেমন করিয়া সফল হইবে? জ্ঞানী ব্রহ্মকে সর্ব্বজীবের মধ্যে উপলব্ধি করিয়া নিজে পরিতৃপ্ত হন এবং সেইরূপ বোধটুকু বজায় রাখিয়া জীবের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য পালন যদি করিতে পারেন, তবেই জ্ঞানীর জীবন সার্থক হয়। আর ভক্ত 'শিব' বা 'নারায়ণ' বোধে সকলের ভিতর যদি ঈশ্বর দর্শন করিতে পারেন, তবেই তিনি যথার্থ ভক্তি লাভ করিয়া একান্ত ভক্ত হইতে সমর্থ হয়েন, কৃতার্থ হইয়া যান। কি জ্ঞানী, কি ভক্ত, উভয়েই একটিমাত্র পথ দিয়াই আপনার বাঞ্ছিতকে সম্পূর্ণরূপে পাইতে পারেন,—সেইটিই হইতেছে স্বভাবসিদ্ধ ধারণার উপযোগী আচরণ। অর্থাৎ আমি যে বিষয়টিকে যেরূপভাবে জানিয়াছি, তাহার প্রতি ঠিক তদুপযোগী ব্যবহার করা; এই ব্যবহার যখন মানুষের বহিরঙ্গ ভাব ছাড়িয়া অন্তরের ভিতর হইতে প্রকাশিত হয়, তখনই তাহার নাম হয় সেবা।

প্রাণের রক্ত ঢালিয়া সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া যে অপরের দুঃখ নিবারণ, তাহাই সেবা। এই সেবা মানুষের মনুষ্যত্ব বা জীবনকে ফুটাইয়া তুলিবার এবং সম্পূর্ণরূপে সার্থক করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সত্য উপায়। এখানে কোনও কৌশল থাকে না, কোনও অপূর্ণতা থাকে না। প্রাণের সমস্ত দ্বার আপন ভাবে উন্মুক্ত হইয়া আপন আচরণের মধ্যেই যাইলে, আপনাকে মানুষ এই ভাবে বিলাইয়া দেয়। 'রাজযোগ' এই কথাটি প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, কর্ম্ম না করিয়া দেহী যখন এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না, তখন যাঁহাদের সঙ্গে কর্ম্ম করিতে হইবে, সেই জীবগণের প্রতি শিবজ্ঞান আরোপ করিয়া তাহাদের সেবারূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই যোগী অচিরে গন্তব্যস্থলে পঁহুছিতে পারেন। আচার্য্য দেব বিবেকানন্দজী ইহাই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সকল পথের যাত্রীর পক্ষে এই সেবা কৌশলের অনুসরণে কর্ম্মানুষ্ঠান এবং জ্ঞান সম্পাদনই শ্রেয়ঃ পথ। দৈনন্দিন জীবনে এবং গৃহাশ্রমের মধ্যেও কিভাবে ঐরূপে জীবমাত্রকেই শিবজ্ঞানে কাজ করিতে পারা যায়, তাহার আর একটি প্রকৃষ্ট উপায় উপনিষদেও আচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ঃ—

পতি পত্নীকে যে ভালবাসেন—তাহার কারণ, আত্মরূপী নারায়ণ পত্নীর ভিতর রহিয়াছেন বলিয়া। কেননা আত্মাকেই আত্মা প্রিয় বলিয়া বোধ করে। সেইজন্য স্ত্রী পতির প্রিয়া হন। আবার পতির ভিতর আত্মা থাকাতে, পত্নীর

মন পতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ আত্মার প্রীতির বা তৃপ্তির জন্যই পতি পত্নীর প্রিয় হন। যেখানে আত্ম-বুদ্ধি বা আত্মার খোঁজ পাওয়া যায় সেইখানেই আত্মা তৃপ্ত হন। আত্মা তৃপ্ত হইবার জন্যই সংসারে ঘুরিয়া ফেরেন। সন্তানগণের প্রীতির জন্য বা সুখের জন্য সন্তানগণ কখন মাতাপিতার প্রিয় হয় না; পরন্তু আত্মতৃপ্তির জন্যই সন্তানগণ মাতাপিতার প্রিয় হইয়া থাকে। যেখানে আত্ম-ভাবের বিকাশ নাই, সেখানে তৃপ্তির সম্ভাবনা নাই। যেখানে আত্মা সজাগ, সেইখানেই উহার তৃপ্তি, ধন রত্ন প্রভৃতি আত্মহীন বস্তুও সকলের প্রিয় হইয়া থাকে, সেখানেও কেবল আত্মতৃপ্তির জন্যই এরূপ হয়। কেননা, ধনরত্নের তৃপ্তির জন্য ধনরত্ন কাহারও প্রিয় হয় না। পশুপক্ষী প্রভৃতিতে মানুষের যে প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহা উহাদের সুখের জন্য নহে, সজাগ আত্মবান্ মানবের তৃপ্তির জন্যই পশুপক্ষী সকলের প্রিয় হয়। এইরূপ আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ এবং সমস্ত জীবের প্রতি এবং সমস্ত বস্তুর প্রতি আত্মভাবের বিকাশে প্রিয় বুদ্ধি বশতঃ মানব-মন যেখানে আকৃষ্ট হয়, জানিতে হইবে যে, সেইখানেই ঐ সমস্তের ভিতরে আনন্দস্বরূপ ঐশ্বরিক অংশ রহিয়াছে। সেই জন্যই তাহাদের প্রতি প্রীতির সঞ্চার হয়।

ঋষিগণের এই শিক্ষায় মানুষের মনে স্বতঃই উদয় হইতে পারে যে, তবে ত স্বার্থবোধই জগতের সকল কাজের একমাত্র প্রবৃত্তিদায়িনী শক্তি। কারণ, যেহেতু আমি আমাকে

ভালবাসি—সেই হেতু অপরকে ভালবাসিয়া থাকি। উহার মীমাংসা আচার্য্যদেব স্বামী বিবেকানন্দজীর কথায় আমরা পাই যে, এই যে আমাদের "আমি," তাহা সেই প্রকৃত "আমি" বা আত্মার ছায়া মাত্র, যিনি আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছেন। আর সসীম বলিয়াই এই ক্ষুদ্র আমির উপর ভালবাসা অন্যায় ও মন্দ বলিয়া বোধ হয়। সসীমভাবে সারা বিশ্ব স্বরূপ আত্মার প্রতি যে ভালবাসা, তাহাই স্বার্থপরতা বলিয়া প্রতীত হয়। এমন কি, স্ত্রীর যে স্বামীর প্রতি ভালবাসা, তাহা সে জানুক আর নাই জানুক, সে সেই আত্মার জন্যই স্বামীকে ভালবাসিতেছে এবং তাঁহাতে আকৃষ্ট হইতেছে। জগতে উহা স্বার্থপরতারূপে প্রকাশ পাইতেছে বটে, কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে উহা আত্মপরতা বা আত্মতৃপ্তির ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। যখনই কেহ কাহাকেও ভালবাসে তখনই তাহাকে সেই আত্মার মধ্য দিয়াই ভালবাসিতে হয়; তবে এই আত্মাকে ঠিক জানিতে হইবে। যাঁহারা আত্মার স্বরূপ না জানিয়া উহাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের ভালবাসাই স্বার্থপরতা। যাঁহারা আত্মাকে জানিয়া বা উপলব্ধি করিয়া উহাকে ভালবাসেন, তাঁহাদের ভালবাসায় কোন বন্ধন নাই, তাঁহারাই সাধু।

যখনই আমরা ভালবাসাকে সীমাবদ্ধ করি, তখনই যত গোলমাল; আমি যদি কাহাকেও আত্মা হইতে পৃথক্‌ভাবে ভালবাসি—তবে উহা আর যথার্থ ভালবাসা হইল না—উহা স্বার্থপর ভালবাসা হইয়া পড়িল। পরিণাম উহার

দুঃখ ; কিন্তু যদি তাহাকে আত্মরূপে দেখিতে পারি, তখনই উহা হইল প্রেম ; এবং সারা বিশ্বকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া যখন কোন বস্তুতে আসক্ত হই, তখন তাহাতে প্রতিক্রিয়া আসিয়া থাকে এবং তাহারই ফল শোক ও দুঃখ। কিন্তু যদি আমরা সারা জীবজগৎকে আত্মার অন্তর্গত করিয়া আত্ম-স্বরূপে সম্ভোগ করি, তবে তাহা হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আসিবে না ;—ইহাই হইল পূর্ণ আনন্দ।

ভাবই হইতেছে—সকল বন্ধন ও মুক্তি, সকল প্রকার দুঃখ এবং আনন্দের জনক। আত্মাকে জানা বা আত্মার অনুভূতিই সকল আনন্দের নিয়ামক। এই আত্মানুভূতির তত্ত্ব বা পথ মনীষিগণ দেখাইয়াছেন যে, প্রথমে আত্মার কথা শুনিতে হইবে—তারপর বিচার করিতে হইবে—তারপর চিন্তা করিতে হইবে। এই ভাবে ক্রমিক-অভ্যাসের ফলে মানব আত্মাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আমরা এই আত্মার উপলব্ধি না করিতে পারিয়াই এই সুন্দর পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছি, কিন্তু যখনই আমরা আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া—ভালমন্দের ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে ছাড়িয়া দিতে পারিব, তখনই ইহা স্বর্গে পরিণত হইবে। এইরূপ বহু শিক্ষা অতি-প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের ঋষিগণ মানবসাধারণকে দিয়াছেন।

ভক্তি-সূত্রের পরমাচার্য্য দেবর্ষি নারদও জীবগণকে কামক্রোধাদি রিপু সকলের বেগ ফিরাইয়া তাহাদিগকে

ঈশ্বরাভিমুখ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। চাহিতে হয় চাও "তাঁহাকে", ভালবাসিতে হয়, ভালবাস "তাঁহাকে"। এইভাবেই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবাদির সাহায্যে একমাত্র ভগবান্‌কে ভালবাসিবার কথাই তাঁহারা বলিয়াছেন।

এই সকল ভাবসমূহের দ্বারা, অথবা কেবলমাত্র আত্মবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া পরিদৃশ্যমান জীবজগতের সহিত কায়মনোবাক্যে একাত্মানুভবের চেষ্টা করিতে হইবে এবং সেই চেষ্টার ভিতরে আত্মবিস্মৃত হওয়ার জন্য কেবলমাত্র ভালবাসি বলিয়া যে শ্রদ্ধা এবং তাহার সহিত স্বাধীনভাবে যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই প্রকৃত ব্যাবহারিক বেদান্ত এবং এই ব্যাবহারিক বেদান্তের মূল সূত্র হইতেছে সেবা, অর্থাৎ পরকে আপনা হইতে অভিন্ন ভাবিয়া পরের দুঃখকে মিটাইবার জন্য সকল প্রকার ক্লেশ নিজে সহন করা।

সমাপ্ত।

স্বনামধন্য খ্যাতনামা পুরুষ স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের মধ্যম পুত্র স্বর্গীয় হরিপদ পাল—যৌবনের প্রারম্ভে ১৩০৬ সালের ৮ই ভাদ্র স্নেহময় জনক-জননীর ক্রোড়ে দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার পুণ্য স্মৃতিরক্ষাকল্পে তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর শুদ্ধচিত্ত লোকপ্রিয় দাতা স্যার্ শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর পাল মহাশয় এই 'সেবা' গ্রন্থখানির সম্পূর্ণ মুদ্রণ-ব্যয় অর্পণ করিয়া সেবাধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। আমরা এই মহানুভব দাতার দীর্ঘজীবন এবং সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি। ইতি—

১৩৩৭ সাল
কার্ত্তিক।

প্রকাশক—

পরিশিষ্ট

ইং ১৯০০ সাল হইতে ১৯২৯
সেবাশ্রমের কার্য্যের

বৎসর	অন্তর্বিভাগ			
	আশ্রমে চিকিৎসিত এবং সাহায্য-প্রাপ্ত ব্যক্তির জাতি-বর্ণানুসারে মোট সংখ্যা			
	হিন্দু	খৃষ্টিয়ান	মুসলমান	মোট সংখ্যা
১৯০০—১	...	...	...	৩৮
১৯০১—২	...	...	...	৭৭
১৯০২—৩	...	...	...	
১৯০৩—৪	...	..		
১৯০৪—৫				
১৯০৫—				
১				

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৩ই জুন ১৯০০ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত বাৎসরিক আয়-ব্যয় এবং স্থায়ী তহবিলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

বৎসর	জমা	খরচ	মন্তব্য
জুন ১৯০০ সাল হইতে ১৯০১ জুন পর্য্যন্ত	৭৮৯॥৫	৬২৯৸৵১০	
জুলাই ১৯০১ হইতে জুন ১৯০২ পর্য্যন্ত	১৬৬৭॥১৫	১১৬৯৸/১	এই জমা-খরচের মধ্যে ২,১০,৯০০ টাকার কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি ক্রয় করিয়া স্থায়ী তহবিল (যাহার মাত্র সুদ আশ্রম-কার্য্যে ব্যয় হয়) করা হইয়াছে। উহার বিস্তৃত বিবরণ (পরিশিষ্টের ৩ হইতে ৮ পৃষ্ঠায়) দেখান হইল।
জুলাই ১৯০২ হইতে জুন ১৯০৩	৫৬৩২৸১০	১৪৩৬৸৵	
জুলাই ১৯০৩ হইতে জুন ১৯০৪	১৮৩৮/৫	১৩৮৯৸৶/১০	
জুলাই ১৯০৪ হইতে জুন ১৯০৫	৪৬৭৩৴৫	.৫৩২৸৵১০	
জুলাই ১৯০৫ হইতে জুন ১৯০৬	৩৩৮০৸৶/০	১৫৬৯৷৵০	
জুলাই ১৯০৬ হইতে জুন ১৯০৭	৬০১৭৷৵০	৭৬৮৪৷৶/১০	
জুলাই ১৯০৭ হইতে জুন ১৯০৮	৫৯৯১॥৵০	২০৩৯৷১০	
জুলাই ১৯০৮ হইতে জুন ১৯০৯	২৩১২৭৸৶/০	১৮৯৪১৶/০	
জুলাই ১৯০৯ হইতে জুন ১৯১০	২৬৮২৭॥/৫	২৯৭৪৩৸১৫	

বৎসর	জমা	খরচ
জুলাই ১৯১০ হইতে জুন ১৯১১	৩২০৪।/০	৬৭৯৩।১৫
জুলাই ১৯১১ হইতে জুন ১৯১২	২৬৩২৭॥১০	১১১১৫৸৫
১৯১৩	২০১১১৵১০	১৩০৪৫৸১০
১৯১৪	১৯২১৭৻১৫	২৫৪৪৪৵১৫
১৯১৫	২৫৯০৬।৵১৫	৫৪২০০৸/১৫
১৯১৬	২৬৭৭৪॥১৫	৩৫৩১৭৸১৫
১৯১৭	৩৯৭২৭৸১০	৫৫৩২১।/১০
১৯১৮	৩১৬৫২।১৫	২৮৭৩৩।৶০
১৯১৯	৬৪০১৩৸৶১০	৫৭৮৩৪॥/১০
১৯২০	৩৯৩৭২/১৫	৩১৬৬৮৸/১০
১৯২১	৪১৮০২॥০	৪৮৫০০।/১০
১৯২২	৪৯৭২৪৶৫	[illegible]৪।৫
১৯২৩	৪৯২৭৪/১০	৫৩৩৭৬৸৶৫
১৯২৪	৬৩৬১৮॥৶৫	৫৮৮৫৭।/১৫
১৯২৫	৪২৪৬৪/০	৪৬১১০॥৶০
১৯২৬	৪৫৮৬২৸/১০	৪০৯৩১॥৫
১৯২৭	৬৫৮২৪॥/৫	৩৭৫৯৪৸১৫
১৯২৮	৫৮২২৫।১৫	৪১৪৯৯৵০
১৯২৯	৪৭১৬০॥১৫	৩৯৫৬০॥৶৫
মোট	৮,৫০,২১০।৵৫	৭,৭০,২৭৯৶৫

ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কে মোট জমা ... ৭৫,২৯২৸৵১৫

পোষ্ট অফিসে মোট জমা ৩,৫০৫৵০

আশ্রমে মোট জমা ১,১৩২৸/১৫

মোট ৭৯,৯৩১৵১০

আশ্রমের স্থায়ী তহবিল।

ইং ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত।

(এই তহবিলের টাকার সুদ মাত্র ব্যয়িত হয়)

বৎসর	বিবরণ	কোম্পানির কাগজ
১৯১১—১৪	শ্রীমতী মণ্ডকুর উমাবাঈ—পীড়িতদিগের জন্য	১৭০০৲
১৯১২	শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায়—একজন অথর্ব্বের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে	২০০০৲
১৯১২	শ্রীযুক্ত পরমানন্দ সেন—পীড়িতদিগের জন্য	৫০০৲
১৯১২—১৭	তিনটি হিন্দু ভদ্র মহিলা কর্ত্তৃক প্রদত্ত—সেবকদিগের জন্য	৪০০৲
১৯১৩—২৮	স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র দাস মহাশয়ের ষ্টেট হইতে অথর্ব্বদিগের জন্য	১২,২০০৲
১৯১৩	শ্রীমতী বিন্দু দাসী—সেবকদিগের জন্য	১০০৲
১৯১৪	স্বামী চিদ্ঘনানন্দ ভারতী— পীড়িতদের জন্য	১১০০৲
”	শ্রীযুক্ত আর, এম্, চাটার্জ্জী ঐ	১০০৲
১৯১৪—১৫	শ্রীমতী রাজবালা দেবী ঐ	১০০০৲
১৯১৬	শ্রীযুক্ত হারাধন নাগ—একজন রোগীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থে	৩০০০৲
”	শ্রীমতী মুক্তকেশী দেবী—পীড়িতদিগের জন্য	১০০৲
”	শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ঐ	১০০৲
১৯১৬—২২	শ্রীমতী তারাসুন্দরী দাসী ঐ	১১০০৲
১৯১৭—২২	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ঘোষ— পীড়িতদিগের জন্য	৫৬০০৲
১৯১৭	রায় বাহাদুর দুর্গাদাস বসু ঐ	৫০০০৲

বৎসর	বিবরণ	কোম্পানির কাগজ
"	শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু—একজন রোগীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থে	৩০০০৲
১৯১৭	শ্রীমতী হেমলতা বসু—একজন অথর্ব্বের ব্যয়ের জন্য	২০০০৲
"	শ্রীযুক্ত পরাণচন্দ্র দত্ত— পীড়িতদের জন্য	১৭০০৲
"	শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী ঐ	৫০০৲
১৯১৮	হরশঙ্কর দাস ও ক্ষেত্রমণি দাসী—একটি রোগীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থে	৪৫০০৲
"	ত্রিবেদী জেঠাভাই আম ভাই দাস ও হরি ভাই—পীড়িতদিগের জন্য	১৫০০৲
"	শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সেন—সেবকদিগের জন্য	১০০৲
১৯১৯	রায় ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র বাহাদুর—পীড়িতদের জন্য *	৩৫,০০০৲
"	পণ্ডিত রামশঙ্কর মিশ্র—দুই জন অথর্ব্বের জন্য	৩৭০০৲
"	বলরাম কৃষ্ণভামিনী— রোগীর জন্য	১৬০০৲
"	শ্মশানমিত্র কুটীর ঐ	১০০৲
"	শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র সুর ঐ	৫০০৲
"	শ্রীমতী নবীনকালী দেবী ঐ	৫০০৲
"	শ্রীযুক্ত বি, এম্, সাহা কুণ্ড ও শ্রীমতী পরমাসুন্দরী দাসী ঐ	৩০০৲
"	শ্রীযুক্ত মণিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ	১০০৲
১৯২০	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঐ	৫০০৲

* ইনি একটি বাটী সেবাশ্রমে উইল করিয়া দিয়া যান। ঐ বাটীর বিক্রয়-লব্ধ ঐ টাকা কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়া আর্ত্ত-নারায়ণের সেবার জন্য স্থায়ী তহবিলে জমা রাখা হইয়াছে।

বৎসর	বিবরণ		কোম্পানির কাগজ
১৯২০	শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদাবিহারী চট্টোপাধ্যায়—	রোগীর জন্য	১০০৲
১৯২১	শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন সিক্দার—	অথর্ব্বদের জন্য*	১০,০০০৲
„	শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মিত্র—	পীড়িতদের জন্য	১৬০০৲
১৯২১—২২	রায় ভুবনমোহন বসু বাহাদুর	ঐ	১৩০০৲
১৯২১	শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু	ঐ	৪০০৲
„	শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী দাসী	ঐ	২০০৲
১৯২২	শ্রীমতী প্রসন্ন দাসী	ঐ	৮০০৲
„	শ্রীযুক্ত রামলাল সিংহ	ঐ	৮০০৲
„	শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দাসী	ঐ	৫০০৲
১৯২২—২৩	শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দ স্মৃতি	ঐ	৪০০৲
„	শ্রীমতী কৈলাসমণি দাসী	ঐ	৪০০৲
„	জনৈকা মহিলা	ঐ	২০০৲
„	শ্রীযুক্ত হরিপদ দে	ঐ	২০০৲
„	আইভা স্মৃতি	ঐ	২০০৲
„	বাবু পরাণচন্দ্র বসাক	ঐ	২০০৲
„	বলরাম ভাইজী নাথ স্মৃতি	ঐ	২০০৲
„	শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী	ঐ	১০০৲
„	শ্রীমতী সুখদাসুন্দরী	ঐ	১০০৲
১৯২৩	শ্রীমতী চন্দ্রীবিবি—	দরিদ্রের জন্য	৫০০০৲
„	শ্রীমতী উষাঙ্গিণী বিশ্বাস— একজন রোগীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থে		৫০০০৲
১৯২৩—২৮	শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায়—	পীড়িতদের জন্য	১০,৬০০৲

* কর্সিয়াংএর বাড়ী বিক্রয়-লব্ধ টাকা হইতে উক্ত টাকা স্থায়ী তহবিলে জমা রাখা হইয়াছে।

বৎসর	বিবরণ		কোম্পানির কাগজ
১৯২৩	* শ্রীমতী নলিনীসুন্দরী দাসী—		
		একজন রোগীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থে	২৪০০৲
"	শ্রীমতী সুরবালা দেবী	ঐ	২০০০৲
"	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র দাস—	পীড়িতদের জন্য	১৫৫০৲
"	শ্রীমতী মণি দাসী	ঐ	৬৫০৲
"	রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ	ঐ	৫০০৲
"	শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	ঐ	১০০৲
"	শ্রীমতী থাকমণি দাসী	ঐ	৩০০৲
"	" চন্দ্রমুখী দেবী	ঐ	২০০৲
"	" মুনি দেবী	ঐ	২০০৲
"	" কুমুদিনী রায় চৌধুরী	ঐ	১০০৲
১৯২৪	শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষ	ঐ	১১,৭০০৲
"	শ্রীমতী অঘোরমণি দাসী	ঐ	১০০০৲
"	স্বর্গীয়া যদুনাথ ঘোষ	ঐ	৫০০৲
"	শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন	ঐ	৫০০৲
"	স্বর্গীয়া হেমলতা দাসী	ঐ	২০০৲
১৯২৫	শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—		
		একটি রোগীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থে	৩৫০০৲
১৯২৫	কুমার লক্ষ্মীন্দ্রনারায়ণ ও শ্রীমতী সর্ব্বেশ্বরী আইদেবী	একটি রোগীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থে	৩৫০০৲

* দাতা কোম্পানির কাগজের সুদ সহ ৪৬৲ টাকা প্রতি বৎসর দেন।

বৎসর	বিবরণ	কোম্পানির কাগজ	
১৯২৫	সাঙ্গ্‌বা যশোবন্তরাজাধ্যক্ষ—	রোগীদের জন্য	১৫০০৲
”	শ্রীমতী রাজবালা দেবী	ঐ	১২০০৲
”	শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়	ঐ	৭০০৲
১৯২৬	শ্রীমতী সত্যবতী দাসী	ঐ	৩২০০৲
”	” চুণীমণি দাসী	ঐ	৬০০৲
”	শ্রীযুক্ত ভূতনাথ সেন	ঐ	৫০০৲
”	শ্রীযুক্ত কাশীনাথ সাফাওয়ালা	ঐ	২০০৲
”	শ্রীযুক্ত হরকান্ত মুখোপাধ্যায়	ঐ	১০০৲
”	শ্রীমতী মন্দাকিনী বাঈ	ঐ	১০০৲
”	শ্রীমতী জানকী বাঈ	ঐ	১০০৲
”	শ্রীমতী লক্ষ্মী বাঈ	ঐ	১০০৲
১৯২৭	স্বর্গীয় রামচন্দ্র মিত্র ষ্টেট্	ঐ	৫০০০৲
”	স্বর্গীয় চন্দ্রকুমার সরকার—	একটি রোগীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থে	৫০০০৲
”	ডাঃ রাজচন্দ্র দত্ত ও স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ দত্ত	ঐ	৫০০০৲
১৯২৭ ”	শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র	—রোগীদের জন্য	৫০০৲
”	শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—	একজন অথর্ব্বের জন্য	৩০০০৲
১৯২৮	শ্রীযুক্ত দাশরথি মুখার্জ্জি—	একটি রোগীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থে	৫৪০০৲

বৎসর	বিবরণ	কোম্পানির কাগজ	
১৯২৮	রায় বাহাদুর কৈলাসচন্দ্র বসু	ঐ	৪০০০৲
,,	জনৈক সহৃদয় লোকের স্ত্রীর স্মরণার্থে মারফৎ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়	ঐ	৪০০০৲
,,	স্বর্গীয় রামচন্দ্র মুখার্জ্জি—	পীড়িতদের জন্য	১৩০০৲
,,	শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাসীর স্মরণার্থে	ঐ	৭০০৲
,,	স্বর্গীয় ক্ষেত্রপাল সিংহ	ঐ	৫০০৲
,,	জনৈক পৃষ্ঠপোষক—	সেবকদের জন্য	৫০০৲
,,	শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজীর স্মরণার্থে—	পীড়িতদের জন্য	১০০৲
,,	স্বর্গীয়া অশ্রুলতা লাহা	ঐ	১০০৲
,,	শ্রীমতী বগলামুখী দেবী	ঐ	১০০৲
,,	শ্রীযুক্ত অম্বিকানাথ শর্ম্মা বিশ্বাস	ঐ	১০০৲
,,	বাবু ব্রজকিশোর টাণ্ডন ক্ষেত্রী—	ঔষধের জন্য	১০০৲
১৯২৯	শ্রীমতী সুভদ্রা দেবীর স্মরণার্থে—	একটি রোগীর ব্যয়নির্ব্বাহার্থে	৪১০০৲
,,	জনৈকা মহিলার স্মৃতার্থে—	পীড়িতদের জন্য	২৯০০৲
,,	শ্রীমতী বিরাজকুমারী বসুর স্মরণার্থে—	ঔষধ ব্যয়ের জন্য	১০০০৲
,,	রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ—	চাঁদার পরিবর্ত্তে	৭০০৲
,,	শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকারের স্মরণার্থে—	সেবকদের জন্য	৫০০৲
,,	শ্রীমতী মণিকুমারী ছত্রানী—	রোগীদের জন্য	১০০৲
			২, ১০, ৯০০

আশ্রমের অস্থায়ী তহবিল—

১৯১০-১৯২৯ *	সাধারণ ও গৃহ-নির্ম্মাণ তহবিল	৪৯,৩০০৲
	পোষ্টেল ক্যাশ সার্টিফিকেটে জমা	৫৪০০৲
		মোট—২,৬৫,৬০০৲

* উক্ত টাকা আশ্রম প্রয়োজন হইলে কোম্পানির কাগজ ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করিতে পারেন।

কলিকাতা শ্যামবাজার কম্বুলিয়াটোলা নিবাসী ৺বেণীমাধব নিয়োগী মহাশয় তাঁহার কাশীধামের ডি ৩১।১২৫ নম্বর কাপাসিয়া ব্রহ্মপুরী-স্থিত বাটী সেবাশ্রমের রোগীদের সেবার্থে উইল করিয়া যান। সেবা-আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত বাটী বিক্রয় করিয়াছেন এবং বিক্রয়-লব্ধ টাকার স্থদ দ্বারা দাতার ইচ্ছানুযায়ী আর্ত্ত-নারায়ণের সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতেছে।

মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত আজিমগঞ্জ নিবাসী ডাক্তার রাধিকা-প্রসাদ মুখার্জ্জি মহাশয় কাশীধামে পীতাম্বরপুরা স্থিত বি ৫।১৪৫এ নম্বর তাঁহার নিজ বসতবাটী ১৯২৪ সালে সেবাশ্রমকে দান করিয়া যান। উক্ত বাটীর ভাড়া হইতে একটি রোগীর ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

বীরভূম জিলার কোগ্রাম-নিবাসী শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী ২২ বিঘা ১৩ কাঠা ব্রহ্মোত্তর জমি সেবাশ্রমকে দান করিয়া গিয়াছেন। সেবাশ্রম উক্ত জমীর দখল লইয়া ১৯২১ সাল হইতে খাজনা আদায় করিয়া দাতার ইচ্ছানুযায়ী আর্ত্ত-নারায়ণের সেবায় ব্যয় করিতেছেন।

বেনারসের বাবু রাধাচরণ সাহেব, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহার পিতা ৺লক্ষ্মীনারায়ণ সাহেবের স্মরণার্থে ৭৫০০৲ টাকার একটি ট্রাষ্ট ফণ্ড করিয়া সেবাশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এবং উক্ত টাকার কোম্পানির কাগজ গভর্ণমেণ্টের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। উক্ত টাকার আয় হইতে দাতার ইচ্ছানুযায়ী সেবাশ্রমের দুইটি বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগীর সেবা-কার্য্য নির্ব্বাহ হয়।

আশ্রমস্থিত বিভাগ, গৃহ ও বাটিসমূহের

স্মৃতি-পরিচয়।

কলিকাতা এণ্টালী-নিবাসী ৺দেবনারায়ণ দেবের পৌত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনারায়ণ দেব মহাশয়ের আশ্রম-নির্ম্মাণার্থে জমি ক্রয়ের জন্য প্রথম দান ইং ১৯০২ সালে — ৪০০০৲

জেলা হুগলীর বাঁশবেড়িয়া নিবাসী আশ্রমের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ পালের আশ্রম-নির্ম্মাণার্থ জমি ক্রয়ের জন্য দ্বিতীয় দান ইং ১৯০৪ সালে — ২০০০৲

১ নং চিত্র শ্রীমন্দির:—এই মন্দিরে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের এবং শ্রীমদাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দজীর চিত্রপট রহিয়াছে। তথায় নিত্য তাঁহাদের প্রতি সেবকগণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে সামান্য পূজা হয় এবং সেবকগণ নিয়মিত তাহাতে ধ্যান ধারণাদির অভ্যাস করিয়া থাকেন। এই মন্দির আমেরিকার যুক্তরাজ্য-নিবাসী মিষ্টার লেগেট মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রাণা পত্নী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ইং ১৯১২ সালে — ২০০০৲

২ নং চিত্র:—ইহা একটি বৃহৎ বাটি। উহার একটি বড় গৃহ আশ্রমের আফিসের জন্য এবং দুইটি ছোট গৃহ হোমিও এবং এলোপ্যাথিক ডিস্পেন্সারির জন্য আজমতগড়ের মাননীয় সার রাজা মতিচাঁদ সাহেব বাহাদুর নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রী স্বর্গীয়া কেশরী বিবির স্মরণার্থে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ইং ১৯০৮ সালে— ৬০০০৲

২ এ নং গৃহখানি—কলিকাতার দর্জ্জিপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত

শশিভূষণ মান্না মহাশয়ের ব্যয়ে তাঁহার স্বর্গীয় মাতা-পিতার স্মৃতিকল্পে নির্ম্মিত। ইং ১৯১৯ সালে— ৫০০৲

২ বি নং গৃহখানি—কলিকাতার দর্জ্জিপাড়ার শ্রীমতী সারদাময়ী দাসী কর্তৃক তাঁহার স্বর্গীয় স্বামী অক্ষয়কুমার দাসের স্মরণার্থে প্রতিষ্ঠিত। ১৯২০ সালে ২০০০৲

২ সি নং গৃহখানি—নাগপুরের স্বর্গীয় রমণীমোহন চৌধুরী ও তদীয় পত্নী কাত্যায়নী চৌধুরাণীর স্মরণার্থে ময়মনসিংহ টাঙ্গাইলের অন্তর্গত আলিশাকান্দার নিবাসী তাঁহাদিগের জামাতা শ্রীযুক্ত যাদবগোবিন্দ রায় কর্তৃক অর্পিত। ১৯১৯ সালে ৫০০৲

২ ডি নং গৃহখানি—স্বর্গীয়া আশালতা বসুর স্মৃতিকল্পে তদীয় স্বামী হাওড়া-রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসু মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উহা একটি অস্ত্রচিকিৎসা-কক্ষ। ইং ১৯২৫ সালে ২৩০০৲

২ ই নং গৃহখানি—কাশীধামের শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গীয়া পত্নী যোগমায়া দেবীর স্মৃতিকল্পে তাঁহাদের পুত্রগণ-কর্তৃক অর্পিত। ১৯১৭ সালে ৪০০৲

২ এফ্ নং গৃহখানি—নির্ম্মাণ ব্যয় পাঁচ শত টাকা। দাতার মুক্ত হস্ত প্রার্থনীয়। ৫০০৲

৩ নং 'নীরজিনী বসু মল্লিক ওয়ার্ড':—

কলিকাতার জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু-মল্লিক মহাশয় কর্তৃক তদীয় স্বর্গীয়া পত্নীর নামে অর্পিত। ৬ জন রোগী থাকিবার উপযোগী, একটি বিভাগ ১৯১০ সালে ৩০০০৲

এতদ্ভিন্ন মাসিক ৩০৲ টাকা হিসাবে রোগীদিগের সেবার জন্য দিতেছেন।

৪ নং 'শ্রীকান্ত ওয়ার্ড':—

টাকীর জমীদার শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক

তদীয় স্বর্গীয় পিতৃদেবের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত। ছয় জন রোগী থাকিবার উপযোগী একটি বিভাগ। ১৯১১ সালে ৩০০০৲

৫ নং 'যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ওয়ার্ড' :—

কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বসু মহাশয় কর্ত্তৃক অর্পিত ছয়জন রোগী থাকিবার উপযোগী, একটি বিভাগ। ১৯১১ সালে ৩০০০৲

এতদ্ভিন্ন মাসিক ৪৫৲ টাকা হিসাবে রোগীদিগের সেবার জন্য দিতেছেন।

৬ নং 'হরিবল্লভ বসু ওয়ার্ড' :—

কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বসু ও নিত্যানন্দ বসু মহাশয়গণ কর্ত্তৃক, তাঁহাদের জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের স্মরণার্থে অর্পিত। ছয় জন রোগী থাকিবার উপযোগী একটি বিভাগ। ১৯১০ সালে ৩০০০৲

৭ নং 'দক্ষিণেশ্বর মালিয়া ওয়ার্ড' :—

রাণীগঞ্জ—সিয়াড়সোলের শ্রীমতী রাণী ভবসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক তাঁহার দেবপ্রতিম স্বর্গীয় স্বামীর পুণ্যস্মৃতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত—চারিজন রোগী থাকিবার উপযোগী একটি বিভাগ। ১৯০৯ সালে ২০০০৲

৮ নং 'শ্যামাসুন্দরী ওয়ার্ড' :—

পুরীধামের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত অটলবিহারী মৈত্র কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর স্মরণার্থে প্রতিষ্ঠিত। ৪ জন রোগী থাকিবার উপযোগী একটি বিভাগ। ১৯০৮ সালে ১৫০০৲

৯ নং 'নন্দলাল ঘোষ ওয়ার্ড' :—

কলিকাতা-নিবাসী সহৃদয় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থে প্রদত্ত। চারিজন রোগীর বাসোপযোগী একটি বিভাগ। ১৯০৯ সালে ২০০০৲

এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ঘোষ মহাশয় রোগীদের সেবার জন্য ১১,৭০০ টাকার কোম্পানির কাগজ উইল-সূত্রে সেবাশ্রমে দান করিয়া গিয়াছেন।

১০ নং 'মাণিকচন্দ্র বিন্দুবাসিনী ওয়ার্ড':—

নদীয়া মুড়াগাছা-নিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র কর্তৃক তদীয় মাতা-পিতার স্মরণার্থ, পাঁচজন রোগীর বাসোপযোগী একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। ১৯১০ সালে ২০০০৲

১০ এ নং "শিবরাণী স্মৃতি":—

কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুত হরিপদ দত্ত ও কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়গণ কর্তৃক অর্পিত। দুই জন রোগী থাকিবার উপযোগী একখানি গৃহ—১৯২৫ সালে ৫৬৪৲

১০ বি নং 'লক্ষ্মীনারায়ণ ত্রিপুরাসুন্দরী ওয়ার্ড':—

কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ দত্ত ও কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দ্বয় কর্তৃক তদীয় জনক-জননীর পুণ্যস্মৃতিকল্পে পাঁচজন আর্ত্তনারায়ণের স্থান উপযোগী একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। ১৯১০ সালে ২০০০৲

১১ নং 'হরসুন্দরী স্মৃতি':—

কলিকাতার শ্রীযুক্ত যদুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক, তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর স্মরণার্থে একটি রন্ধনশালা অর্পিত। ১৯১০ সালে ৮০০৲

১১ এ নং 'রাধিকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি':—

জেলা ২৪ পরগণার পানিহাটী-নিবাসিনী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী কর্তৃক তাঁহার স্বর্গীয় পতির নামে উৎসর্গীকৃত একটি ভাণ্ডার-গৃহ। ১৯১২ সালে ১০০১৲

১১ বি নং 'সরোজিনী স্মৃতি' :—

বর্দ্ধমান শাকনাড়াবাসী, বেগুসরাইএর উকিল শ্রীযুত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণা পত্নীর স্মৃতিকল্পে স্থাপিত একটি ভাণ্ডার-গৃহ। ১৯২৪ সালে ৮৩৬৲

১২ নং 'একটি পাকশালা' :—

উহা পীড়িত নারায়ণগণের জন্য বিশেষ পথ্য প্রস্তুতার্থে ব্যবহার হয়। উহার জন্য দাতার দান প্রার্থনীয়। এই গৃহটির জীর্ণাবস্থা উপস্থিত, তাহার সংস্কার আবশ্যক।

১২ এ নং 'ফুলেশ্বরী স্মৃতি :—

শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায়চৌধুরী তাঁহাদের বাটীর পুরাতন দাসী স্বর্গীয়া ফুলেশ্বরী দাসীর স্মরণার্থে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা উহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। উহা একটি স্বতন্ত্র পথ্য গৃহ। ১৯১৬ সালে, ২৫০৲

১২ বি নং 'প্রিয়নাথ স্মৃতি' :—

বল্লভপুরের শ্রীযুত পঞ্চানন চৌধুরী মহাশয় দ্বারা তাঁহার খুল্লতাত স্বর্গীয় প্রিয়নাথ চৌধুরীর স্মরণার্থে নির্ম্মিত একটি স্নানাগার। ১৯১৮ সালে ২৫০৲

১৩ নং একটি গোদাম ঘর—নির্ম্মাণ-ব্যয় ৮০০৲

১৩ এ নং একটি স্নানাগার—নির্ম্মাণ-ব্যয় ৩০০৲

১৪ নং একটি গোদাম ঘর—নির্ম্মাণ-ব্যয় ৮০০৲

১৪ এ নং একটি গোদাম ঘর—নির্ম্মাণ-ব্যয় ৮০০৲

১৫ নং 'রামলাল স্মৃতি' :—

কলিকাতা বড়বাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র শেঠ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি স্নানাগার। ১৯১০ সালে ৩০০৲

১৬ নং কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী গোরক্ষপুরের উকিল শ্রীযুত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক স্থাপিত একটি স্নানাগার। ১৯১৩ সালে। নির্ম্মাণ ব্যয় ৩৮০৲

১৭ নং 'রাজবালা নির্ব্বাণ-গৃহ':—

কলিকাতা ভবানীপুরের শ্রীযুত যদুপতি চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অর্পিত ১৯১০ সালে। নির্ম্মাণ-ব্যয় ৩০০৲

১৮ নং হাওড়া চংঘুরালী-বাসী স্বর্গীয় দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মরণার্থে একটি গৃহ। ১৯১৫ সাল, নির্ম্মাণ-ব্যয় ৫০০৲

১৮ এ নং কলিকাতা ভবানীপুরবাসী গোরক্ষপুরের উকিল শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গৃহখানির নির্ম্মাণ ব্যয় পাঁচশত টাকা আশ্রমে দিবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়া উহাতে একখানা মার্ব্বেল ট্যাবলেট্ স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি অল্পকাল মধ্যেই ৺কাশীলাভ করেন, সুতরাং তাঁহার প্রতিশ্রুতিমত টাকা আশ্রমে জমা হয় নাই।

১৯ নং 'বিনোদাসুন্দরী স্মৃতি':—

কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুত চন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গগতা পত্নীর নামে একটি স্নানাগার উৎসর্গীকৃত। ১৯১০ সালে নির্ম্মাণ-ব্যয় ৩০০৲

২০ নং 'তারিণীচরণ ভোঁষ স্মৃতি':—

কলিকাতা হ্যারিসন রোডের শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ ভোঁষ মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থে একটি গৃহ উৎসর্গীকৃত। ১৯১১ সালে ৩০০৲

২০ এ নং 'কাদম্বিনী স্মৃতি':—

উপরি উক্ত শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ ভোঁষ মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গীয়া মাতাঠাকুরাণীর স্মরণার্থে একটি গৃহ উৎসর্গীকৃত। ১৯১১ সালে ৩০০৲

২০ বি নং 'মৃণালিনী স্মৃতি' :—

উপরি উক্ত শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ ভোঁষ মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গীয়া কন্যার স্মৃতিস্বরূপ একটি গৃহ উৎসর্গীকৃত, ১৯১১ সালে ৩০০৲

২০ সি নং 'নগেন্দ্রবালা স্মৃতি' :—

উপরি উক্ত শ্রীযুত গিরীন্দ্রনাথ ভোঁষ মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গগতা কন্যার স্মরণার্থ এক গৃহ উৎসর্গীকৃত। ১৯১১ সালে ৩০০৲

২১ নং 'রামলাল বসু স্মৃতি' :—

জেলা বর্দ্ধমান বড়োগ্রামের শ্রীমতী রাজকুমারী দাসী কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর স্মরণার্থ একটি স্নানাগার উৎসর্গীকৃত। ১৯১২ সালে ৩০০৲

২২ নং 'মাধবচন্দ্র স্মৃতি' :—

কলিকাতা বাগবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত বটুবিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থ একটি বৃহৎ সঞ্চিত জলের চৌবাচ্চা স্থাপিত। ১৯১৩ সালে। নির্ম্মাণ-ব্যয় ৮০৲

২৩ নং 'রাধাসুন্দরী গুহ ওয়ার্ড' :—

ময়মনসিংহের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় কর্ত্তৃক তাহার স্বর্গীয়া পত্নীর স্মরণার্থ আটজন সংক্রামক রোগীর বাসোপযোগী একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। ১৯২১ সালে ৭৫০০৲

২৪ নং 'গিরিবালা স্মৃতি' :—

কলিকাতা জানবাজার-নিবাসিনী শ্রীমতী পতিতপাবনী দাসী কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গীয়া কন্যার স্মরণার্থে একটি বিশ্রামাগার স্থাপিত। ১৯২৭ সালে ১০০০৲

পুরুষ বিভাগ

1 শ্রীশ্রীস্বামীজীর মন্দির
2 অফিস ও বাহিরের রোগীদের জন্য ঔষধালয়—শ্রীমতী ি
বিবি
2 A শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মান্না মহাশয়ের "পিতৃমাতৃ-স্মৃতিগেহ"
2 B "অক্ষয়-মন্দির"
2 C "৺রমণীমোহন চৌধুরী ও ৺কাত্যায়নী চৌধুর"
2 D "শ্রীমতী আশালতা-স্মৃতি অস্ত্রকক্ষ"
2 E "শ্রীমতী যোগমায়া-স্মৃতি"
2 F একটি কক্ষ
3 "নীরজিনী বসু মল্লিক ওয়ার্ড"
4 "টাকী শ্রীকান্ত ওয়ার্ড"
5 "যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ওয়ার্ড"
6 "হরিবল্লভ বসু ওয়ার্
7 "দক্ষিণেশ্বর মা
8 "শ্যামাসুন্দ
9 "নন্দলাল
10 "মাণিব
10 A "শি
10 B "
11 র
11
11
1

২৫ নং 'পরাণচন্দ্র দত্ত ওয়ার্ড' :—

কলিকাতার বেনেপুকুর-নিবাসিনী শ্রীমতী হরিমতি দাসী কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গীয় পতির স্মরণার্থে চারিজন রোগীর বাসোপযোগী একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। ১৯১৭ সালে ৩৫০০৲

২৬ নং 'শ্রীমতী রাজরঙ্গিণী দাসী' :—

তাঁহার স্বর্গীয় মাতা-পিতার স্মৃতিকল্পে একটি গৃহ প্রতিষ্ঠিত। ১৯২১ সালে ৫০৫৲

২৭ নং 'বটকৃষ্ণ পাল স্মৃতিসৌধ' :—

এই স্বনামধন্য ভাগ্যবান্ পুরুষের জ্যেষ্ঠপুত্র ৺ভূতনাথ পাল মহাশয়ের পুত্রগণ এবং (সেজোবাবু) সার হরিশঙ্কর পাল ও (ছোটবাবু) শ্রীযুক্ত হরিমোহন পাল মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক একটি অস্ত্র-চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৪ সালে ৮২৯৫৲

উক্ত সার হরিশঙ্কর পাল মহাশয় সেবাশ্রমে প্রতিবৎসর ডাক্তারি যন্ত্রাদি এবং ঔষধ প্রভৃতি দ্বারা বহুভাবে সহায়তা করিতেছেন।

২৮ নং—ইহা একটি পুরুষ অথর্ব্বদিগের বিভাগ :—

তাহাতে মোট ১৯টি বাসোপযোগী গৃহ আছে এবং উহাতে সর্ব্বসমেত ২৯ জন অথর্ব্ব ব্যক্তির বাসোপযোগী স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। এই বাটীখানির গৃহগুলি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের স্মৃতিকল্পে দাতাগণের অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে।

২৮ (১) নং গৃহ—কলিকাতা শ্যামবাজারের শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী শিবকালী দেবীর ব্যয়ে একখানি গৃহ নির্ম্মিত। ১৯১৫ সালে ৯৩০৲

২৮ (২) নং গৃহ আনন্দকুমার রায় চৌধুরী স্মৃতি—২৪ পরগণার

বারুইপুরের জমিদার উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রাণা পত্নী শ্রীমতী মুক্তকেশী দাসী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ১৯১৬ সাল— ৮৯০৲

২৮ (৩) নং গৃহ গোরক্ষপুরের ডাক্তার রায় সাহেব যজ্ঞেশ্বর রায় কর্ত্তৃক তদীয় মাতাপিতার স্মৃতিকল্পে এই গৃহখানি উৎসর্গীকৃত। ৯১৯ সাল— ১০০০৲

২৮ (৪) নং গৃহ ভবতারিণী দেবী স্মৃতি :—হাওড়া, বাজেশিবপুরের তদীয়া পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ও প্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক এই গৃহখানি উৎসর্গীকৃত। ১৯১৪ সাল— ১০০১৲

২৮ (৫) নং গৃহ নবীনচন্দ্র কুণ্ডু স্মৃতি :—কলিকাতা ঠনঠনিয়ার শ্রীযুত রামলাল কুণ্ডু কর্ত্তৃক এই স্নানাগার স্থাপিত। ১৯১৮ সাল—৩০০৲

২৮ (৬) নং গৃহ উহা একটি স্নানাগার। নির্ম্মাণ ব্যয়— ৩০০৲

২৮ (৭) নং গৃহ উহা একটি ভাণ্ডার গৃহ। নির্ম্মাণ ব্যয়— ৩০০৲

২৮ (৮) নং গৃহ কাদম্বিনী দাসী স্মৃতি :—কলিকাতার শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ বসাক কর্ত্তৃক এই ভাণ্ডার গৃহখানি স্থাপিত। ১৯২৭ সাল— ৩২৫৲

২৮ (৯) নং গৃহ—এই গৃহখানি যশোহর-নিবাসী শ্রীযুক্ত মধুসূদন নন্দী ও নিস্তারিণী দাসী কর্ত্তৃক প্রদত্ত। ১৯২৯ সাল— ৭০০৲

২৮ (১০) নং গৃহ—রায় যোগেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুর স্মৃতি :—কলিকাতা ভবানীপুরের তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৬ সাল— ৮০০৲

২৮ (১১) নং
২৮ (১২) নং } গৃহ—'চন্দ্রমণি দেবী স্মৃতি' :—এই গৃহ দুইখানি তাঁহার কন্যা শ্রীমতী বসন্তকুমারী দেবী কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত। ১৯২৬ সাল— ২০১৫৲

২৮ (১৩) নং গৃহ উমাশশী দাসী স্মৃতি :—

কলিকাতার রাধাবল্লভ বসাক মহাশয় কর্ত্তৃক তদীয় সহধর্ম্মিণীর স্মৃতি স্বরূপ এই গৃহখানি প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৭ সাল— ১০০০৲

২৮ (১৪) নং গৃহ জগন্মোহিনী দেবী স্মৃতি :—

মুঙ্গেরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক তদীয় মাতাঠাকুরাণীর নামে অর্পিত। ১৯২৬ সাল— ৭০০৲

২৮ (১৫) নং }
২৮ (১৬) নং } গৃহ—তিনকড়ি দাসী স্মৃতি :—

কলিকাতা রঙ্গমঞ্চের প্রসিদ্ধা নায়িকার বিষয় হইতে ট্রাষ্টিগণ কর্ত্তৃক এই গৃহ দুইখানি নির্ম্মিত। ১৯১৮ সাল— ৩০০০৲

২৮ (১৭) নং, ২৮ (১৮) নং, ২৮ (১৯) নং গৃহ—পুরুলিয়ার সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত ললিতকিশোর মিত্র ও তদীয় পত্নী শ্রীমতী নীলাম্বুবরণী দাসী মহাশয়ার সাহায্যে এই তিনখানি গৃহ নির্ম্মিত। ১৯২৪ সাল— ৪০০৫৲

২৮ (২০) নং গৃহ মুঙ্গেরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যয়ে এই গৃহখানি নির্ম্মিত। ১৯২৬ সাল—৯০০৲

২৮ (২১) নং গৃহ রামকুমার সেন স্মৃতি :—

ময়মনসিংহ আটঘরিয়া-নিবাসী উক্ত সেন মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রাণা পত্নী শ্রীমতী স্বর্ণময়ী সেন কর্ত্তৃক এই গৃহখানি প্রতিষ্ঠিত। ১৯১৯ সাল— ১০০০৲

২৮ (২২) নং গৃহ নীরদমোহিনী দেবী স্মৃতি :—

কলিকাতা শোভাবাজারের শ্রীযুক্ত রামতারণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক তদীয় পত্নীর স্মৃতিকল্পে এই গৃহখানি স্থাপিত। ১৯১৭ সাল—৬০০৲

২৮ (২৩) নং গৃহ—রাজসাহীর পাঁচুপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বেণীমাধব সাহা কুণ্ডু মহাশয়ের মাতা-পিতার স্মৃতিকল্পে এই গৃহখানি শ্রীযুক্ত বেণীমাধব সাহা কুণ্ডু ও তৎপত্নী শ্রীমতী পরমাসুন্দরী দাসী কর্ত্তৃক অর্পিত। ১৯১৯ সাল— ১৩০০৲

২৮ (২৪) নং গৃহ—'অবসর প্রাপ্ত সবজজ' :—শ্রীযুক্ত কিশোরী-মোহন সিকদার মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার মাতা-পিতার স্মৃতিকল্পে এই গৃহখানি অপিত ১৯১৬ সাল— ১০০০৲

২৯ নং "মহেন্দ্রনাথ কাশীশ্বরী ওয়ার্ড" :—

হাওড়া শিবপুর-নিবাসী স্বর্গীয় হরিনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র, দার্জ্জিলিং এর উকিল স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় সহধর্ম্মিণী স্বর্গীয়া কাশীশ্বরী দেবীর স্মৃতিকল্পে ১২টি রোগীর বাসোপযোগী এই বিভাগটি তাঁহাদিগের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ২৯ এ নং দার্জ্জিলিং-এর উকিল স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথের স্মৃতিকল্পে তদীয় কনিষ্ঠ সহোদরগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। উক্ত ২৯-এ নম্বরটি ২৯ নম্বর বিভাগের একটি অংশ বিশেষ মাত্র। এতদুভয়ের নির্ম্মাণ-ব্যয় স্বর্গীয় মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রগণ কলিকাতার ডেপুটি পুলিস কমিশনার মিঃ বি, এন, ব্যানার্জ্জি, ব্যারিষ্টার মিঃ এস্, এন্, ব্যানার্জ্জি, মিঃ আর, এন্, ব্যানার্জ্জি এবং ডাক্তার ডি, এন্ ব্যানার্জ্জি এম্-ডি মহোদয়গণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত। ১৯২৬ সাল— ১৫,২৫০৲

৩০ নং ভূতনাথ স্মৃতি চত্বর :—

স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্বর্গীয় ভূতনাথ পাল মহাশয়ের স্মরণার্থে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সার হরিশঙ্কর পাল মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৫ সালে নির্ম্মাণ ব্যয়— ১৫০০৲

৩১ নং বেতনপ্রাপ্ত সাহায্যকারিগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণ ব্যয়—৮০০৲

৩২ নং দুইটি ঘর—নির্ম্মাণ ব্যয়—   ১০০০৲

৩৩ নং গোশালা প্রভৃতি—নির্ম্মাণ ব্যয়—   ৩০০৲

৩৪ নং অম্বিকাসুন্দরী দাসী স্মৃতি :—

ঢাকা দশোরা-নিবাসী স্বর্গীয় রামকমল ঘোষ মহাশয়ের পুত্র হাওড়া অম্বিকা আশ্রমের অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক তদীয় মাতাঠাকুরাণীর স্মৃতিকল্পে এই বাটীখানি প্রতিষ্ঠিত। ১৯২৪ সাল—   ১০,৫০০৲

৩৫ নং গোশালা :—নির্ম্মাণ ব্যয়—   ২০০৲

৩৬ নং এই গৃহখানি—মুঙ্গেরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুনীতিদেবী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ১৯২৬ সাল—   ৯০০৲

৩৭ নং কূপ হইতে স্নানীয় ও পানীয় জল সংগ্রহের ব্যবহারার্থে এই স্থানটি মুঙ্গেরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত। ১৯২৬ সাল—   ৩৬০৲

৩৮ নং বেতন প্রাপ্ত সাহায্যকারিগণের ৬টি বাসগৃহ। নির্ম্মাণ ব্যয়—   ১০০০৲

৩৯ নং মহেন্দ্রচন্দ্র-নিত্যময়ী স্মৃতি :—

হুগলী, তড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ননালাল সাহা মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার মাতা-পিতার স্মৃতিকল্পে ১২ জন কর্ম্মীর বাসোপযোগী এই দ্বিতল বাটীখানি প্রতিষ্ঠিত। ১৯১৭ সাল—   ৪৬৬৬৲

৪০ নং একটি স্নানাগার। নির্ম্মাণ ব্যয়—   ৩০০৲

মহিলা বিভাগ।

৪১ নং 'অক্ষয়কুমার ঘোষ ওয়ার্ড' :—

কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটার স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতিস্বরূপ তৎপত্নী শ্রীমতী চারুশীলা দাসী মহাশয়া কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৯জন রোগী থাকিবার উপযোগী একটি বিভাগ। ১৯১৫ সাল— ৫৫০০৲

৪২ নং 'বিপিনবিহারী মিত্র ওয়ার্ড' :—

কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী স্বর্গীয় রায় বিপিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিস্বরূপ তৎপত্নী শ্রীমতী শরৎকুমারী মিত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৯ জন রোগী থাকিবার উপযোগী একটি বিভাগ। ১৯১৬ সাল—৫৫ ০৲

৪৩ নং 'মোহনলাল আত্মাসুন্দরী ওয়ার্ড' :—

কলিকাতা শ্যামবাজার-নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ও চন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক তাঁহাদের স্বর্গীয়া মাতা-পিতার স্মৃতি-স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত ৯জন রোগী থাকিবার উপযোগী একটি বিভাগ। ১৯১৬ সাল—৫৫০০৲

৪৪ নং 'রাণী বিদ্যাময়ী ওয়ার্ড' :—

ময়মনসিংহ মুক্তাগাছার জমিদার রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী বাহাদুর কর্ত্তৃক তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর স্মৃতি স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত। ইহা ৬ জন রোগীর বাসোপযোগী একটি বিভাগ। নির্ম্মাণ ব্যয় ১৯১৬ সাল * —৩৫০০৲

৪৫ নং 'শশিভূষণ ও বিধুভূষণ ওয়ার্ড' :—

কলিকাতা বহুবাজারের শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিদ্ মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার পরলোকগত পুত্রদ্বয়ের স্মরণার্থে অর্পিত। ছয় জন রোগীর বাসোপযোগী একটি বিভাগ। নির্ম্মাণ ব্যয় * — ৪২৫১৲

* এই চিহ্নিত দুইটি বিভাগের টাকা ১৯১০ সালে পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু তৎকালে আশ্রম নির্ম্মাণার্থে যে ভূমি ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব দাতাগণের অর্থে বাটী নির্ম্মিত হইয়া সমস্ত স্থানটি পূর্ণ হইয়া যাওয়ায় তৎপর আশ্রমের বিস্তার আবশ্যক বশতঃ জমি সংগৃহীত হইলে ১৯১৬ সালে ঐ দুইটি বিভাগ নির্ম্মিত হয়।

৪৬ নং 'সংক্রামক রোগের ওয়ার্ড' ঃ—

এই বিভাগটিতে ৮টি রোগীর বাসোপযোগী স্থান রহিয়াছে এবং উহার নির্ম্মাণ-ব্যয় নিম্নের দাতাগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে ঃ—

৪৬ (১ ও ২) নং গৃহ দুইটি বাঁকিপুরের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ স্বর্গীয় কেদারনাথ সেনগুপ্ত মহাশয়ের স্মৃতিস্বরূপ তদীয় পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।
১৯১৮ সাল— ৩০০০৲

৪৬ (৩) নং গৃহখানি কলিকাতার বিখ্যাত কয়লা ব্যবসায়ী শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র সরকার মহাশয়ের নামে নির্ম্মিত ঃ—

৪৬ (৪) নং গৃহখানি উক্ত শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রাণা পত্নী শ্রীমতী নিকুঞ্জকুমারী দাসীর নামে নির্ম্মিত ঃ—

৪৬ (৫) নং গৃহখানি স্বর্গীয় বিহারীলাল সরকার মহাশয়ের স্মৃতি-কল্পে তৎকন্যা শ্রীমতী নিকুঞ্জকুমারী দাসী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঃ—

৪৬ (৬) নং গৃহখানি স্বর্গীয়া আহ্লাদিনী দাসীর স্মৃতিকল্পে তৎকন্যা শ্রীমতী নিকুঞ্জকুমারী দাসী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

উপরি উক্ত এই চারিখানি গৃহই কলিকাতার বিখ্যাত কয়লা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ধর্ম্মপ্রাণা পত্নী শ্রীমতী নিকুঞ্জকুমারী দাসীর ব্যয়ে নির্ম্মিত। ১৯২২ সাল— ৩৫০০৲

৪৭ নং বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দাস কর্ত্তৃক এই স্নানাগারখানি তাঁহার স্বর্গীয় মাতাঠাকুরাণীর স্মৃতিস্বরূপ অর্পিত।
১৯১৮ সাল— ৩০০৲

৪৭-এ নং একটি স্নানাগার ঃ—নির্ম্মাণ ব্যয়— ৩০০৲

৪৮ নং মহিলা বিভাগের রন্ধনশালা ও ভাণ্ডার-গৃহ। নির্ম্মাণ ব্যয়— ১০০০৲

৪৯ নং 'পান্নালাল শেঠ স্মৃতি' :—

কলিকাতা বড়বাজারের শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র শেঠ ও রায় নলিনানাথ শেঠ বাহাদুর কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্মৃতি রক্ষার্থে একটি বৃহৎ বাটী মহিলা সেবিকাদিগের জন্য অর্পিত। ১৯২৩ সাল—১৭১০১৲

৫০নং একটি স্নানাগার। নির্ম্মাণ ব্যয়— ৬০০৲

৫১ নং একটি স্নানাগার। নির্ম্মাণ ব্যয়— ৬০০৲

৫২ নং কলিকাতা বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বটুবিহারী চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক একটি সঞ্চিত জলের চৌবাচ্চা প্রতিষ্ঠিত। ১৯২১ সাল— ১০০৲

৫৩ নং ভূতনাথ তোরণদ্বার :—

স্বর্গীয় বটকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের স্মরণার্থে সার হরিশঙ্কর পাল মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত একটি লৌহ-ফটক। ১৯২৬ সাল— ১৯৬১৲

৫৪ নং ২৪ পরগণার বসিরহাটের শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্ত্তৃক একটি লৌহ ফটক ও রেলিং প্রদত্ত। ১৯০৮ সাল— ১০০০৲

৫৫ নং দক্ষিণ দিকের লৌহ ফটক :—নির্ম্মাণ ব্যয়— ২০০৲

৫৬ নং পশ্চিমদিকের লৌহ ফটক :—ব্যয়— ৫০০৲

৫৭ নং সঞ্চিত জলের বৃহৎ চৌবাচ্চা :—নির্ম্মাণ ব্যয়— ২৫০৲

শাখা আশ্রম ঃ

দশাশ্বমেধ-এর সন্নিকট কাশীধামের প্রসিদ্ধ রুদ্রাক্ষমালা-বিক্রেতা ৺নিবারণচন্দ্র দাস তাঁহার বসতবাটিখানি ১৯১২ সালে সেবাশ্রমে দান করেন। তথায় আশ্রমের একটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে ১৪ জন অথর্ব মহিলার বাসোপযোগী স্থান আছে।

নিম্নলিখিত নম্বরের বাটি সকল এখনও প্রস্তুত হয় নাই। ঐ সকলের প্রয়োজন বিধায় নক্সায় নম্বর অনুসারে বাটি সকল দেখান হইয়াছে এবং উহার খরচের বরাদ্দ মোটামুটি করিয়া রাখা হইয়াছে।

৫৮ নং মহিলা বিভাগের জন্য প্রস্তাবিত রন্ধনশালা ও ভাণ্ডার গৃহ। ৮০০০৲

৫৯ নং মহিলা বিভাগে অস্ত্রচিকিৎসিতদের জন্য প্রস্তাবিত বিভাগ। ১৫,০০০৲

৬০ নং পুরুষ বিভাগে চক্ষু চিকিৎসিতদের জন্য প্রস্তাবিত বিভাগ। ১৫,০০০৲

৬১ নং পুরুষ অথর্ব্ব নিবাসের জন্য প্রস্তাবিত একটি রন্ধনশালা ও ভাণ্ডার গৃহ। ২৫০০৲

৬২ নং পুরুষ সেবকদিগের বাসের জন্য প্রস্তাবিত একটি বাটী, লাইব্রেরী এবং রন্ধনশালা ও ভাণ্ডার-গৃহের অনুমান ব্যয় ২২০০০৲ টাকা। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান জেলার জমিদার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসন্ন মুখার্জ্জি মহাশয় উহার অর্দ্ধাংশের ব্যয় ১১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই বাটীর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকার জন্য দাতাগণের নিকট প্রার্থনা।

৬৩ নং প্রস্তাবিত মহিলা অথর্ব্ব বিভাগ—উহাতে ৫০টি গৃহে ৫০ জন অথর্ব্বের বাসোপযোগী স্থান হইবে। প্রত্যেকটি গৃহের নির্ম্মাণ ব্যয় আউট হাউস প্রভৃতি এবং জমির মূল্য সহ অনুমান ১২০০৲ টাকা করিয়া লাগিবে। তজ্জন্য জমি সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধন কুটীর—কিষেণপুর

১৯২৫ সালের মার্চ্চমাসে, দেরাদুনের অন্তর্গত কিষেণপুর নামক গ্রামে স্বামী শুভানন্দজী, দুইটি পাকা বাটী সহ প্রায় চারি বিঘা জমি বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট স্বামী শিবানন্দজী ও সম্পাদক স্বামী সারদানন্দজীর নামে ক্রয় করেন।

এই আশ্রম ৺কাশীধাম শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রাচীন সেবকগণের বাসার্থে এবং কার্য্যক্ষম সেবকগণের কার্য্যকালে স্বাস্থ্য ও সাধন-ভজনাদির উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই আশ্রমের—পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর মনোনীত "শ্রীরামকৃষ্ণ সাধন-কুটীর" নাম প্রদান করা হইল এবং এই আশ্রম বেলুড় মঠের অঙ্গস্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয়।

এই সাধন-কুটীরের কার্য্যভার পরিচালনের জন্য কাশী সেবাশ্রমের প্রাচীন সেবকগণের মধ্য হইতে একটি কমিটি গঠন হয়। কমিটির অধিকাংশের মতানুযায়ী কুটীরের কার্য্য পরিচালিত হইবে। বৎসরান্তে একবার কুটীরের অধ্যক্ষ আয়-ব্যয় প্রভৃতির একটি মোটামুটি হিসাব বেলুড় মঠের অধ্যক্ষগণের নিকট পাঠাইবেন এবং এই হিসাব কমিটির অন্ততঃ তিন জনের অনুমোদিত হইবে।

কমিটির মেম্বর পরিবর্ত্তিত বা পুনর্গ্রহণ করিতে হইলে কমিটির অধিকাংশের মতানুযায়ী কাশীধাম সেবাশ্রমের পুরাতন সেবকগণ হইতে গ্রহণ করা হইবে।

কমিটি—

(১) স্বামী শুভানন্দজী, সভাপতি। (অধ্যক্ষ)
(২) স্বামী কালিকানন্দ, মেম্বর।
(৩) স্বামী সদাশিবানন্দ ”
(৪) ,, অসীমানন্দ ,,
(৫) ,, অচলানন্দ ,,
(৬) ,, অবধূতানন্দ ,,
(৭) ,, সত্যানন্দ ,,
(৮) ,, নরোত্তমানন্দ ,,

১৯২৫ সালের মার্চ্চমাস হইতে ১৯২৭ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত উক্ত সাধন-কুটীরের সংক্ষিপ্ত জমা-খরচ :—

জমা	খরচ
কাশীধামের স্বর্গীয় জ্ঞানানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতিস্বরূপ তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নবনলিনী দেবী প্রদত্ত একটি বাটির মূল্য স্বরূপ— ৩০০০৲	সাধন-কুটীর ক্রয় এবং মেরামত খরচ—মারফত স্বামী অমৃতেশ্বরানন্দ ৪৬৫৯৲
বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার স্মৃতিকল্পে একটি গৃহের মূল্য স্বরূপ প্রতিশ্রুতি মধ্যে— ২৭৫৲	১৯২৫ জুলাই হইতে ৫ই মে ১৯২৭ সাল যাবৎ আশ্রমের বিবিধ খরচ—মাং স্বামী নরোত্তমানন্দ ১৭৩৶১০
কলিকাতা ভবানীপুর নিবাসী স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার লাহা মহাশয়ের স্মৃতিকল্পে তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নীরদামণি লাহা কর্তৃক প্রদত্ত মহাশয়া একটি বাটীর মূল্য স্বরূপ—১৫০০৲	১৯২৭ সালের ১৪ই মে হইতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত আশ্রম বাটীগুলির সম্পূর্ণ মেরামত জন্য ব্যয়—মারফত স্বামী নরোত্তমানন্দ ১৪৩০৶০
১৯২৭ সাল ৩১ আগষ্ট পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এককালীন দান এবং চাঁদা প্রভৃতি বাবদ মোট জমা— ২১৭৬৷৶১০	১৯২৭ সাল আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত আশ্রমে আহারাদি প্রভৃতি যাবতীয় খরচ মোট ৬৫৯৶১০
	৬৯২১৷৷৴০
	আশ্রম তহবিল নগদ ৪৬৶১০
৬৯২৬৷৶১০	৬৯২৬৷৶১০

১৯০০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কাশীধামে সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত সভ্যগণ দ্বারা প্রথম কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মনোনীত হইয়াছিল।

কাশীধাম

৺কাশীধাম দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার-সমিতির প্রথম কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা ঃ—

১।	রায় প্রমদাদাস মিত্র বাহাদুর।	সভাপতি
২	মাননীয় রাজা মুন্সী মাধোলাল।	সহকারী সভাপতি
৩।	বাবু গোবিন্দদাস অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনার।	”
৪।	বাবু মোক্ষদাদাস মিত্র জমিদার।	সম্পাদক
৫।	রায় শম্ভুপ্রসাদ জমিদার।	কোষাধ্যক্ষ
৬।	শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন মজুমদার	সহকারী সম্পাদক
৭।	শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দাস (আশ্রম-কর্ম্মিদ্বয়)	সহকারী সম্পাদক

সভ্যগণ ঃ—

৮।	রায় সাহেব বিনায়করাও পেন্‌সে।	মহাজন
৯।	বাবু বালকৃষ্ণ দাস।	,,
১০।	বাবু কেশো দাস।	,,
১১।	গোঁসাই ভবানীপুরী।	মিউনিসিপাল কমিশনার
১২।	বাবু সোমনাথ ভাদুড়ী, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট	
১৩।	বাবু শ্যামাচরণ সান্যাল, এজেট কুচবিহার ষ্টেট্	
১৪।	,, অন্নদাচরণ দত্ত বি, এ, এল, এল, বি।	
১৫।	ডাক্তার ভুবনমোহন সেন।	

১৬। ডাক্তার প্রিয়নাথ বসু।

১৭। বাবু অভয়াচরণ সান্ন্যাল, } প্রফেসার

১৮। „ হরিকেশব সান্ন্যাল, } প্রফেসার

১৯। „ গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু। পেন্‌সনার

২০। „ নিবারণন্দ্র গুপ্ত এম্, এ, এল, এল, বি।

২১। পণ্ডিত শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য।

২২। বাবু রাজেন্দ্রনাথ মৈত্র।

২৩। ব্রহ্মচারী বিভূতিপ্রকাশ নিগমাচারী ... আশ্রমকর্ম্মী

২৪। „ কেদারনাথ ... ... ঐ

২৫। শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ... ঐ

২৬। „ হরিনাথ ওহ্‌দেদার ... ঐ

২৭। „ গোপাললাল মিত্র বি, এ, এল, এল, বি হিসাব-পরীক্ষক

কলিকাতা *

ডাক্তার অমৃতলাল সরকার এল, এম, এস, এফ, সি, এস (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ বসু বি, এ,
ও
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখার্জ্জি এম, এ, বি, এল, } সহ-সম্পাদক
(বর্ত্তমানে জাষ্টিস্)

শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চাটার্জ্জি বি, এল, (কোষাধ্যক্ষ)

---

* কলিকাতা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য মহোদয়গণ যে চাঁদা বা এককালীন দান আদায় করিতেন, তাহা কাশীধামের দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার-সমিতির কার্য্যে ব্যয়িত হইত।

সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী

দরিদ্র, পরিশ্রমে অশক্ত, ব্যাধিগ্রস্ত নরনারীগণকে যথাশক্তি সাহায্য প্রদান করাই সমিতির উদ্দেশ্য স্থির হইল। অন্নাভাবে যাঁহারা কষ্ট পাইতেছেন, সমিতি তাঁহাদিগকে অন্ন দান করিবেন। অর্থাভাবে যে সমস্ত দরিদ্র-সংসারে রোগের চিকিৎসা হইতেছে না, সমিতি সেখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। যেখানে রোগীর শুশ্রূষাকারীর অভাব, সমিতির কর্ম্মিগণ সেখানে গিয়া রোগীর সেবা করিবেন। গৃহহীন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। হাঁসপাতালে যাইতে অক্ষম রোগীকে সমিতির গৃহে রাখিয়া চিকিৎসা ও সেবা করিবেন। গৃহশূন্য নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করিবেন। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এবং তিনি স্ত্রী বা পুরুষ যেই হউন না কেন, সমিতির কর্ম্মিগণ তাহার সেবা করিবেন। যে সকল ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি অতি নিঃস্ব হইয়া প্রাণত্যাগে প্রস্তুত, তথাপি সাধারণ দান-স্থলে উপস্থিত হইবেন না বা ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন না, সমিতির কর্ম্মিগণ বিশেষরূপে তাঁহাদের অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিবেন। যাঁহারা অন্ধ বা অথর্ব্ব বা বৃদ্ধ বলিয়া ভিক্ষাদি করিতে অসমর্থ, সমিতির কর্ম্মিগণ তাঁহাদের বাসস্থলে যাইয়া তাঁহাদের অন্নবস্ত্র বা বাসাভাড়া দিয়া আসিবেন। যাঁহারা পীড়িত ও অসহায় অবস্থায় রাস্তায় পতিত থাকিবেন, সমিতির কর্ম্মিগণ তাঁহাদিগকে রাস্তা হইতে উঠাইয়া আশ্রমে আনিয়া তাঁহাদের ঔষধ-পথ্য দান এবং সেবাশুশ্রূষা করিবেন। এইগুলি প্রধানতঃ সমিতির কার্য্যরূপে নিরূপিত হইল। এইরূপে দুই বৎসর

কার্য্য নির্ব্বাহ হইবার পর বিগত ২৩শে নবেম্বর ১৯০২ তারিখে কারমাইকেল লাইব্রেরিতে এক সাধারণ সভা আহ্বান পূর্ব্বক সমিতির কার্য্যভারাদি সকল বিষয় রামকৃষ্ণ মিশন হস্তে অর্পণ করিবার প্রস্তাব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক সেবাশ্রমের স্থানীয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা সর্ব্বপ্রথম নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া গঠিত হয় এবং নিম্নলিখিতরূপে আশ্রমের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হয়। এই নিয়মানুসারে সেবকগণ আশ্রম-কার্য্য অদ্যাবধি পরিচালন করিতেছেন।

দি রামকৃষ্ণ মিশন কর্ত্তৃক মনোনীত

প্রথম স্থানীয় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা :—

মাননীয় রাজা মুন্সী মাধোলাল	সভাপতি
বাবু গোবিন্দদাস (অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট) বাবু মোক্ষদাদাস মিত্র (ঐ) মুন্সী দয়াশঙ্কর (কাশী মহারাজের দেওয়ান সাহেব)	সহকারী সভাপতি
বাবু কালিদাস মিত্র (অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট) রায় শম্ভুপ্রসাদ (রহিস)	সম্পাদক
বাবু নিবারণচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল ...	কোষাধ্যক্ষ
বাবু চারুচন্দ্র দাস ... (আশ্রম-কর্ম্মী) বাবু যামিনীরঞ্জন মজুমদার ,,	সহকারী সম্পাদক
বাবু হরিনাথ ওহ্‌দেদার ,, ...	সভ্য
ব্রহ্মচারী বিভূতিভূষণ নিগমাচারী ,, ...	ঐ
,, কেদারনাথ ,, ...	ঐ
বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ,, ...	ঐ
,, জগদ্দুর্লভ ঘোষ ...	ঐ

মিরজা জামালুদ্দিন আহাম্মদ খাঁ সাহেব	...	সভ্য
মৌলবী মহম্মদ ওমরে সাহেব	...	ঐ
বাবু ব্রজমোহন দাস সাহেব	...	ঐ
,, সানওয়ার সিং অবসরপ্রাপ্ত সবজজ	...	ঐ
,, রামপ্রসাদ চৌধুরী সাহেব	...	ঐ
শেঠ শ্যামদাসজী সাহেব	...	ঐ
মিঃ, এ, সি, থাবুলওয়াল	...	ঐ
পণ্ডিত শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য	...	ঐ
বাবু শ্যামাচরণ সেন	...	ঐ
,, অন্নদাচরণ দত্ত উকিল	...	ঐ
,, গিরিশচন্দ্র কুণ্ডু পেন্‌সনার	...	ঐ
,, প্রিয়লাল বসু	...	ঐ
,, রাজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র বি, এ	...	ঐ
,, গোপাললাল মিত্র এম্, এ, বি, এল্	...	হিসাব-পরীক্ষক

আশ্রমের নিয়মাবলী।

১। আশ্রমটি "রামকৃষ্ণ মিশনের" শাখারূপে পরিগণিত এবং "রামকৃষ্ণ মিশনের কাশী কেন্দ্রের সেবাশ্রম" নামে অভিহিত হইবে।

অতএব এই আশ্রমের সমুদয় নিয়ম "রামকৃষ্ণ মিশনের" অন্যান্য শাখাকেন্দ্রের নিয়মানুযায়ী গঠিত হইবে।

২। আশ্রমের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা ও এককালীন দান সংগৃহীত হইবে এবং এইভাবে সংগৃহীত অর্থ কেবলমাত্র আশ্রমের জন্যই ব্যয়িত হইবে।

৩। যাঁহারা চাঁদা দিয়া কিংবা অন্য কোন প্রকারে স্বেচ্ছা সহকারে আশ্রমের সাহায্য করিবেন, তাঁহারা এবং আশ্রমের সেবক ও চিকিৎসকগণ ইঁহার সদস্য হইবেন।

৪। আশ্রমের কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য "রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যকরী সমিতি" কর্ত্তৃক একটি স্থানীয় কার্য্যকরী সমিতি গঠিত এবং উক্ত সমিতির সভ্য ও আশ্রমের একজন পরিদর্শক মনোনীত হইবে।

৫। আশ্রমের কল্যাণের জন্য আবশ্যক-মত উক্ত মিশন বর্ত্তমান কার্য্যকরী সমিতির পরিবর্ত্তে নূতন কার্য্যকরী সমিতি গঠিত এবং সমিতির সভ্য ও পরিদর্শক নূতন করিয়া নির্ব্বাচন করিতে পারিবেন।

৬। পরিদর্শক এবং সম্পাদক মহাশয় সমেত সর্ব্বশুদ্ধ একুশ জন সভ্য লইয়া আশ্রমের কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইবে। ভোট সম্বন্ধে প্রত্যেক সভ্যের সমান অধিকার থাকিবে।

৭। সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক চাঁদা ও এককালীন সাহায্য গৃহীত এবং উহার রসিদ প্রদত্ত হইবে।

৮। আশ্রমের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত যাহা কিছু টাকা 'রামকৃষ্ণ মিশন (কাশী কেন্দ্রীয় সেবাশ্রম)' নামে জমা থাকিবে। সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের আবেদন অনুযায়ী কোষাধ্যক্ষ মহাশয় উক্ত জমা টাকা হইতে টাকা বাহির করিতে এবং কোম্পানির কাগজ বদ্‌লাইতে বা উহার সুদ তুলিতে পারিবেন। অবশ্য কোষাধ্যক্ষ মহাশয়কে টাকা তুলিতে ক্ষমতাপন্ন করিবার সময় সম্পাদক বা সহকারী সম্পাদক মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অনুমোদিত প্রস্তাব উদ্ধৃত করিবেন।

৯। সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক মহাশয় নিজেদের দায়িত্বে কুড়ি টাকা পর্য্যন্ত উক্ত জমা হইতে বাহির করিয়া লইতে পারিবেন। এইরূপে টাকা বাহির করা হইলে পরবর্ত্তী অধিবেশনের দিন কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির দ্বারা উহা অনুমোদন করাইয়া লইতে হইবে।

১০। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মাসিক অধিবেশন সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক আহূত হইবে। সমিতির আলোচ্য বিষয় তাঁহারা উক্ত সমিতির প্রত্যেক সভ্যকে যথাসময়ে নিবেদিত করিবেন। এইরূপ অথবা অন্য সভার কার্য্য তাঁহারা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষগণের নিকট প্রেরণ করিবেন।

১১। সম্পাদক মহাশয় প্রতিবৎসর আশ্রমের কার্য্যবিবরণী, রামকৃষ্ণমিশন সভার সভ্যগণ এবং জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবেন।

১২। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রতি অধিবেশনে অন্ততঃ পাঁচজন সভ্যকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। সভাপতি অথবা সহকারী সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে উক্ত সমিতির কোন অধিবেশনে উপস্থিত

সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন।

১৩। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় অধিকাংশ সভ্যের সম্মতি অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে। বিভিন্ন মতাবলম্বীদের সংখ্যা সমান হইলে সভাপতি মহাশয়ের দ্বারা উহার নিষ্পত্তি হইবে।

১৪। উক্ত সমিতির চারিজন মাত্র সভ্যের অনুরোধে সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক মহাশয় সমিতির অধিবেশন করিতে পারিবেন।

১৫। আশ্রম সম্বন্ধে সাধারণের বক্তব্য বিষয় সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে তাঁহারা তাঁহাদের বিবেচনানুযায়ী আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারণ করিবেন। সভার সিদ্ধান্ত সমূহ তাঁহারা সাধারণকে জানাইবেন।

১৬। সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদক মহাশয় সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষর সহিত প্রতি সভার কার্য্য লিখিয়া রাখিবেন। ইঁহারা সাহায্যপ্রাপ্ত লোকের একটি তালিকা এবং জমা ও খরচের হিসাব রাখিবেন এবং এই সমুদয় বিষয় কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মাসিক অধিবেশনে সভ্যগণকে জানাইবেন।

১৭। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির তিন জন সভ্যের মতানুযায়ী সহায়হীন, দরিদ্র, রুগ্ন ও আতুর লোক সকল জাতিধর্ম্ম এবং স্ত্রী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে আশ্রমে স্থান পাইবেন এবং সমিতির সভ্যগণ যতদিন প্রয়োজন বিবেচনা করিবেন, ততদিন তাঁহারা আশ্রমে থাকিতে পারিবেন।

১৮। পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক লোককে আশ্রমে স্থান দিবার পূর্ব্বে তাহার বিষয়-সম্পত্তি এবং যদি আশ্রমে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পর উহা কিরূপে ব্যয়িত হইবে, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে জানিয়া লইয়া একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপে

জানিয়া লইবার সময় অন্ততঃ একজন সরকারী কর্ম্মচারী অথবা সমিতির তিনজন সভ্য উপস্থিত থাকা প্রয়োজন এবং এই তিনজনের মধ্যে একজন সরকারী পেন্‌সনভোগী, সরকারী কর্ম্মচারী অথবা ব্যবহারাজীবী হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ প্রত্যেক ঘটনায় উক্ত খাতায় উপস্থিত লোকের স্বাক্ষর লওয়া হইবে।

১৯। বিশেষ প্রয়োজন বিবেচিত হইলে সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক মহাশয় অপর একজন সভ্যের সহিত পরামর্শ করিয়া, উপযুক্ত পাত্রকে আশ্রমে একদিনের জন্য আশ্রয় দিতে পারেন। এরূপ লোক মুমূর্ষু হইলে তাহার মৃত্যুকালীন উক্তি কোন পুলিশ কর্ম্মচারী অথবা অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট্ অথবা তিনজন ভদ্রলোকের সম্মুখে লিখিত হইবে।

২০। আশ্রমে যাহাদের চিকিৎসা করা হইবে, তাহাদের জন্য একখানি পৃথক্ খাতা রাখা হইবে এবং উহাতে ঔষধ ও পথ্যের বিষয় লিখিত হইবে।

২১। একখানি পৃথক্ খাতায় দর্শকবৃন্দের অভিমত লিখিত হইবে। দর্শকগণ যদি আশ্রম সম্বন্ধে কোনরূপ অনিয়ম লক্ষ্য করেন, অথবা যদি তাঁহারা কোন নূতন বিষয় বলেন, তাহা হইলে সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে তাহা উত্থাপন করিবেন।

২২। রামকৃষ্ণ মিশনের অনুমতি অনুসারে আশ্রমের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি আশ্রমের কার্য্যের সুবিধার জন্য ভবিষ্যতে নূতন নিয়ম করিতে পারিবেন।

২৩। সেবাশ্রমের কার্য্যের নিমিত্ত চাঁদা অথবা এককালীন দান সংগ্রহের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যগণ যাঁহাদিগকে মনোনীত

করিতে পারিবেন, সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক মহাশয় তাঁহা-দিগকে উক্ত কার্য্যে অধিকার দিবার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিয়া তদীয় স্বাক্ষরিত পত্র ও মিশনের সীল প্রদান করিবেন। যাঁহারা দেখিতে চাহিবেন, অর্থ-সংগ্রহকারীরা তাঁহাদিগকে উক্ত পত্র ও সীল দেখাইবেন।

২৪। অর্থ-সংগ্রহকারীরা সাহায্যকারীদের স্বাক্ষর ও দানের পরিমাণ একখানি খাতায় লিখিয়া লইবেন। অর্থ-সংগ্রহকারীরা তাঁহাদের সংগৃহীত অর্থ সাহায্যকারীদের নাম ও ঠিকানা সহ প্রতি সপ্তাহের শেষে সম্পাদক মহাশয়ের নামে প্রেরণ করিবেন। সম্পাদক অথবা সহকারী সম্পাদক মহাশয় সাহায্যকারিগণকে পত্র দ্বারা দান-প্রাপ্তি জানাইবেন।

রামকৃষ্ণ মিশন

(১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত)

এবং

১৮৬০ সালের ২১ আইনানুযায়ী ১৯০৯ সালের ৪ ঠা মে তারিখে রেজেষ্ট্রীকৃত।

ইহার উদ্দেশ্য সমূহ সংক্ষেপে এইরূপ :—

(১) হাওড়ার নিকটবর্ত্তী বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে এবং অন্যান্য স্থানে শিক্ষিত প্রচারকগণ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম বা বেদধর্ম্মের প্রকৃত জ্ঞান প্রদান ও প্রচার করা।

(২) জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ বা সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে আবালবৃদ্ধ নরনারীকে ভগবানের বিভিন্ন বিকাশ জ্ঞানে তাহাদের দৈহিক, নৈতিক, শিক্ষা সম্বন্ধীয় এবং আধ্যাত্মিক অভাব ও দুঃখ কষ্ট মোচন করিয়া সেবা করা।

রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যাবলী নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত হইয়াছে :—

(ক) মিশনারী কার্য্য, (খ) বিশ্বজনীন সেবাকার্য্য, এবং (গ) শিক্ষা-কার্য্য।

প্রচারকার্য্যের প্রধান কেন্দ্রসমূহ ঃ

মঠ বিভাগ।

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ পোঃ, হাওড়া।

(২) ,, ,, বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) গদাধর আশ্রম, ভবানীপুর, কলিকাতা।

(৪) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ওয়ারী, ঢাকা।

(৫) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বালিয়াটি, ঢাকা।

(৬) " " তাজপুর, আমিনপুর, ঢাকা।

(৭) " " বাগেরহাট, খুলনা।

(৮) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর।

(৯) " " মুকদুমপুর, মালদহ।

(১০) " " ময়মনসিংহ।

(১১) " " চণ্ডীপুর, ঈশ্বরপুর, মেদিনীপুর।

(১২) " " গড়বেতা, আমলাগোড়া মেদিনীপুর।

(১৩) মাতৃমন্দির আশ্রম, জয়রামবাটি, দেশরা, বাঁকুড়া।

(১৪) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাঁকুড়া।

(১৫) " মঠ, মুঠীগঞ্জ, এলাহাবাদ।

(১৬) " আশ্রম, মুরাদপুর, পাটনা।

(১৭) " " জামতাড়া, সাঁওতাল পরগণা।

(১৮) " " অদ্বৈত আশ্রম, লাকৃসা, কাশীধাম।

(১৯) " মঠ, ভুবনেশ্বর, পুরী।

(২০) অদ্বৈত আশ্রম (দাতব্য চিকিৎসালয় ও কলিকাতা শাখা সহ) মায়াবতী, আলমোড়া।

(২১) শ্রীরামকৃষ্ণ কুটীর, চিল্কাপেটা, আলমোড়া।

(২২) " সাধন-কুটীর, কিষেণপুর, দেরাদুন।

(২৩) " মঠ, ময়লাপুর, মাদ্রাজ।

(২৪) " " বাসুভ্যানগুডী, ব্যাঙ্গালোর।

(২৫) " " ত্রিবান্দ্রাম, ত্রিবাঙ্কুর।

(২৬) " আশ্রম, হরিপাদ, ত্রিবাঙ্কুর।

(২৭) যোগানন্দ আশ্রম, এলেপী ত্রিবাঙ্কুর।

(২৮) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সালেম।
(২৯) ,, ,, মহীশূর।
(৩০) ,, ,, উতকামন্দ, নীলগিরি হিল্‌স্‌।
(৩১) ,, ,, নেত্রমপল্লী, উত্তর আর্কট।
(৩২) ,, ,, নাগপুর, সি, পি।
(৩৩) ,, ,, খার, বোম্বাই।
(৩৪) ,, ,, ত্রিচুর, কোচিন।
(৩৫) ,, ,, ত্রিঙ্কোমালী, সিংহল;
(৩৬) ,, ,, সলা, নৈটকিনসিউ, খাসিয়া পাহাড়।
(৩৭) প্রেমানন্দ আশ্রম, মোট্টায়াম, হরিপাদ, ত্রিবাঙ্কুর।
(৩৮) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুইলাণ্ডী, উত্তর মালাবার।
(৩৯) ,, মন্দির, তিরুভালা, ত্রিবাঙ্কুর।
(৪০) ,, আশ্রম, নওয়াম, ত্রিবনদ্রম্‌।
(৪১) ,, ,, কুয়ালালমপুর।
(৪২) ,, ,, সিঙ্গাপুর।
(৪৩) বেদান্ত সোসাইটি, ৩৪, ওয়েষ্ট, ৭১ ষ্ট্রীট্‌, নিউইয়র্ক।
(৪৪) বেদান্ত সোসাইটি ১৭৬ মার্লবোর ষ্ট্রীট্‌, বোষ্টন্‌মাস্‌।
(৪৫) হিন্দু টেম্পল্‌, ২৯৬৩, ওয়েবষ্টার ষ্ট্রীট্‌।
সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো, কালিফোর্ণিয়া।
(৪৬) শান্তি আশ্রম, সান্‌ আন্‌টোন ভ্যালি, কালিফোর্ণিয়া।
(৪৭) আনন্দ আশ্রম, লা ক্রেসেণ্টা, কালিফোর্ণিয়া।
(৪৮) বেদান্ত সোসাইটি প্রভিডেন্স (রোডস্‌ আইলেণ্ডস্‌)।
(৪৯) বেদান্ত সোসাইটি চিকাগো।
(৫০) বিবেকানন্দ হোম, হোলিউড, কালিফোর্ণিয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান সেবা-কার্য্যের স্থায়ী কেন্দ্রসমূহ।

১। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম বেনারস্ সিটি।
২। ,, ,, ,, কন্‌খল্, জেলা সাহারান্‌পুর।
৩। ,, ,, ,, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ।
৪। ,, ,, ,, বৃন্দাবন, মথুরা।
৫। ,, ,, ,, নারায়ণগঞ্জ, জেলা ঢাকা।
৬। ,, ,, ,, ওয়ারী, ঢাকা।
৭। ,, ,, ,, তাজপুর, আমিনপুর, জেলা ঢাকা।
৮। ,, ,, ,, বালিয়াটি, জেলা ঢাকা।
৯। ,, ,, ,, ভারুকাটি, নারায়ণপুর, জেলা বরিশাল।
১০। ,, ,, ,, বরিশাল।
১১। ,, ,, কোয়ালপাড়া, কোতলপুর, বাঁকুড়া।
১২। ,, ,, সেবাসমিতি হবিগঞ্জ, শ্রীহট্ট।
১৩। ,, ,, ,, শ্রীহট্ট
১৪। ,, ,, সেবাশ্রম আমিনাবাদ, লক্ষ্নৌ।
১৫। ,, ,, ,, কাঁথি, মেদিনীপুর।
১৬। ,, ,, ,, তমলুক্, মেদিনীপুর।
১৭। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন দাতব্য চিকিৎসালয় বেলুড় মঠ, হাবড়া।
১৮। ,, ,, ,, ,, ভুবনেশ্বর, পুরী।

১৯। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন জয়রামবাটী, দেশরা, বাঁকুড়া।
২০। ,, ,, বিবেকানন্দ সোসাইটি, জামসেদপুর।
২১। ,, ,, সেবাশ্রম রেঙ্গুন।
২২। ,, ,, মোড়াবাদী হিল, রাঁচি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান স্থায়ী শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহ।

১। সিষ্টার নিবেদিতা বালিকাবিদ্যালয় (সীবন ও বয়ন বিভাগ সহ)—নিবেদিতা লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।
২। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাস, ৮ হালদার লেন, বহুবাজার, কলিকাতা
৩। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন অবৈতনিক বিদ্যালয়, ওয়ারী, ঢাকা।
৪। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, বালক ও বালিকা বিদ্যালয় সহ—শরিষা, ডায়মণ্ডহারবার (২৪ পরগণা)
৫। ,, ,, শিল্পবিদ্যালয় বেলুড়, হাওড়া।
৬। ,, ,, আশ্রম, সারগাছি, মুর্শিদাবাদ।
৭। ,, ,, নৈশ বিদ্যালয় কন্‌খল্, সাহারাণপুর জিলা
৮। ,, ,, বিদ্যাপীঠ দেওঘর, বিহার
৯। শ্রীরামকৃষ্ণ ছাত্রাবাস, ময়লাপুর, মাদ্রাজ।
১০। ,, মিশন আশ্রম (সীবন কার্য্য সহ), বরানগর, ২৪ পরগণা।

সাময়িক রিলিফ কার্য্য—

১। দুর্ভিক্ষ, ২। বন্যা, ৩। প্লেগ, ৪। অগ্নি, ৫। ভূমিকম্প, প্রভৃতি।

১। দুর্ভিক্ষকালীন কার্য্যাবলী—

(ক) মুর্শিদাবাদ জেলায়, ১৮৯৬—৯৭, ১৯০৮ সালে
(খ) দেওঘরে, সাঁওতাল পরগণা, ১৮৯৭, ১৯১৯ সালে
(গ) দক্ষিণেশ্বরে, ২৪ পরগণা, ১৮৯৭ সালে
(ঘ) কিশানঘরে (রাজপুতানা), ১৮৯৯—১৯০০ সালে
(ঙ) খাণ্ডোয়া মধ্য প্রদেশে, ১৯০০ সালে
(চ) ত্রিপুরা জেলায়, ১৯০৬—৭, ১৯১৫—১৬ ও ১৯১৯ সালে
(ছ) ডায়মণ্ডহারবারে, ১৯০৬—০৭ সালে
(জ) পুরী জেলায়, ১৯০৮, ১৯১৯—২০ সালে
(ঝ) বাঁকুড়া জেলায়, ১৯১৫—১৬, ১৯১৯ ও ১৯২৮ সালে
(ঞ) মেদিনীপুর, ১৯১৯ ও ১৯২৬ সালে
(ট) বালেশ্বর জেলায়, ১৯১৫ সালে
(ঠ) খুলনা জেলায়, ১৯২১ সালে
(ড) মানভূম জেলায়, ১৯১৯ সালে
(ঢ) শ্রীহট্টে, ১৯০৬—০৭ সালে
(ণ) নোয়াখালিতে, ১৯০৬—০৭, ১৯১ —১৬
(ত) ঢাকা, কাছাড়, ময়মনসিংহ, ফরিদপুরে, ১৯১৫—১৬ সালে
(থ) দিনাজপুর জিলায়, ১৮৯৭, ১৯২৮ সালে
(দ) জামতাড়ায় (সাঁওতাল পরগণা) ১৯১৯, ১৯২৬ সালে

২। বন্যাকালীন রিলিফ কার্য্যাবলী—

(ক) ঘোগা (ভাগলপুর জেলা) ১৮৯৯ সালে

(খ) বেহালা বিষ্ণুপুরে (২৪ পরগণা) ১৯০০ সালে

(গ) উত্তর-বঙ্গ বন্যা রিলিফ, ১৯১৮ সালে

(ঘ) হুগলী জেলায় ও ঘাটালে, ১৯০৯ সালে

(ঙ) বাঁকুড়া, হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলায়, ১৯১৩—১৪ সালে, কাছাড়, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় ১৯১৫ সালে

(চ বীরভূমে, ১৯১৯ সালে

(ছ) মথুরা জেলায়, ১৯১৮—১৯ সালে

(জ) মেদিনীপুর, কটক জেলা, পুরীতে, ১৯২০ সালে

(ঝ) বারাণসী এবং বালিয়া জেলায়, বর্দ্ধমান ও ফরিদপুরে ১৯১৬, কাছাড় ও বর্দ্ধমানে ১৯১৭, আমহার্ষ্ট (ব্রহ্মদেশ) ১৯২০—২১, রাজসাহী, ফরিদপুর ও বাঁকুড়া জিলায় ১৯২২, পাটনা ও আরা জিলায় ১৯২৩ সালে

(ঞ) তাঞ্জোর, ত্রিচি, কুম্বাকোনার এবং ব্রিটিশ মালাবার জেলা সমূহে ও কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য, ভাগলপুর, বৃন্দাবন, মথুরা এবং হৃষীকেশে ১৯২৪ সালে, কাছাড় ও শ্রীহট্ট জিলায় ১৯২৯, আকিয়াব (ব্রহ্মদেশ), মেদিনীপুর জিলায় ১৯২৬ সালে

৩। প্লেগ রিলিফ এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলী—

(ক) বঙ্গদেশে, ১৮৯৯ ও ১৯০০ সালে

(খ) বিহারে, ১৯০৪—৫ ও ১৯১২ সালে

(গ) পাঞ্জাবে, ১৯২৪ সালে

(ঘ) সাগর দ্বীপে মেলার সময়, ১৯১২ এবং ১৯১৪ হইতে ১৯২২ পর্য্যন্ত

৪। ওলাউঠা রিলিফ—

(ক) গঢ়োয়ালে ১৯১৩ সালে, হাওড়া জেলায়১৯১৭ সালে, ঢাকা জেলায় ১৯১৬—সালে, জয়ন্তী ১৯২৪ সালে। মেদিনীপুর পূর্ণিয়া ও হুগলী জিলায় ১৯১৫, মালদহ ও পূর্ণিয়া জিলায় ১৯২৬ সালে

৫। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রিলিফ—

(চ) বারাণসী, নোয়াখালি, বরিশাল, বালেশ্বর ও ঢাকা জেলায় এবং ভুবনেশ্বরে১৯১৮—১৯ সালে

৬। অগ্নি-নির্ব্বাণ কার্য্যাবলী—

(ক) উড়িষ্যায় ১৯১৫, ১৯১৬, ১৯২০ ও ১৯২৩ সালে

(খ) কান্দি (মুর্শিদাবাদ), বৃন্দাবন ১৯১৭ সালে, মেদিনীপুরে ১৯১৯, যশোহর জিলায় ১৯২২

(গ) নিতুঝুড়ি (মানভূম), মনসার হাটে, (২৪ পরগণা), ১৯২৩ সালে, বর্দ্ধমান, কামরূপ, বাঁকুড়া, শরিষা ও বালিডাঙ্গ (২৪ পরগণা), বীরভূমে ১৯২৪ সালে, বাগদা (মানভূম) ১৯২৫, পঞ্চগুডা (পুরী) ১৯২৬, পার্ব্বতীপুর (২৪ পরগণা) এবং আন্দারুয়া (পুরী) ১৯২৭ রামকৃষ্ণপুর (২৪ পরগণা) ও মায়নাপুর (মাদ্রাজ) ১৯২৮, মাদারীপুর (ফরিদপুর) ১৯২৬, নেলোর জিলায় ১৯২৭

৭। ভূমিকম্প ও ভূমি-পতন রিলিফ কার্য্য—

পাঞ্জাবে, ১৯১৫ সালে, বঙ্গদেশে, ১৮৯৯ সালে

৮। বস্ত্র অনটন প্রতীকার কার্য্য—

১৯১৮ এবং ১৯১৯ সালে বঙ্গদেশ, বিহার এবং যুক্ত প্রদেশের বহু জেলায়

৯। ঘূর্ণাবর্ত্তকালীন প্রতীকার কার্য্য—

পূর্ব্ববঙ্গে ১৯১৯ সালে এবং ইছাপুরে (গঞ্জাম), ১৯২৩ সালে।

১০। কুলী রিলিফ কার্য্য ঃ—

চাঁদপুর (ত্রিপুরা) ১৯২১

১১। চন্দ্রগ্রহণ রিলিফ কার্য্য ঃ—

নবদ্বীপ (নদীয়া) ১৯২৫

১২। জল অনটন প্রতীকার কার্য্য ঃ—

কৌরপুর (ফরিদপুর) ১৯২০-২১